মস্তকের মূল্য

প্রভৃতি।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

প্রণীত।

—*—

কলিকাতা।

১৩১৬

মূল্য পাঁচ সিকা।

Published by MONORANJAN BANURJIE from the
"Hitabadi" Library.

Printed by N. B DASS at the "Hitabadi" Press,
70, Colootola Street. CALCUTTA.

উৎসর্গ।

মাতৃভূমির ভাবী কল্যাণ, দেশবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যাঁহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংযম, ধর্ম্ম ও অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদেরই করকমলে গ্রন্থখানি অর্পণ করিলাম।

নিবেদন।

এই সংগ্রহের অধিকাংশ গল্প ইতিপূর্ব্বে "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিদ্বন্দ্বী" শীর্ষক গল্পটি "আরতি" পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

সাহিত্যসম্পাদক, প্রিয়সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় গল্পগুলির ভাষা সংশোধন এবং গল্পাংশের সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ বিধানের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। এ জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। সুকবি শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ও এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি গ্রন্থখানির আমূল 'প্রুফ' সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। পুস্তকের নামকরণ বিষয়ে আমি উভয়েরই কাছে ঋণী। এ ঋণ অপরিশোধনীয়।

আমার বাল্যসুহৃদ্, পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসুর নিকটও আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। তাঁহার সহানুভূতি ও উৎসাহে আমি সাহিত্যসেবায় আনন্দ পাইয়াছি।

চেৎলা, আলিপুর,
১০ই আশ্বিন, ১৩১৬। } শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সূচী।

মস্তকের মূল্য

প্রভৃতি।

মস্তকের মূল্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রাচী-ললাটে উষার হিরণ্ময় মুকুট উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুপ্ত সুন্দরীর জাগরণের ন্যায় বনরাণীর কমনীয়, পেলব দেহে প্রাণস্পন্দন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। সমরসিংহ সাজি-ভরা, শিশির-স্নাত ফুলের গুচ্ছ সহ কুটীর-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বারপথে উঁকি মারিয়া দেখিল, গৃহে কেহ নাই। গুরুদেব স্নান সারিয়া এখনও ফিরেন নাই? আজ এত বিলম্ব হইতেছে কেন?

গৃহের এক পার্শ্বে সাজি রাখিয়া সমর ডাকিল, "অজয়!"

কেহ উত্তর দিল না। তখন সমরসিংহ বাহিরে আসিয়া একখানি বড় পাথরের উপর বসিল। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে স্বরচিত একটি ভজন গায়িতে লাগিল।

অদূরে গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের বিরাট দেহ প্রথম সূর্য্যরশ্মির অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত। কুহেলিকামুক্ত নীল অরণ্য, কুসুম-চিত্রিত লতাকুঞ্জ স্বপ্নদৃষ্ট পরীরাজ্যের ন্যায় জাগিয়া উঠিতেছিল। নীল শূন্য কি উদার, কি মহান্, কি পবিত্র! বিশ্বলক্ষ্মী কি মুক্তহস্তে সমস্ত সৌন্দর্য্য এই তপোবনে ঢালিয়া দিয়াছেন?

সমরসিংহ গান ছাড়িয়া মুগ্ধের ন্যায় বনলক্ষ্মীর বিচিত্র শোভা দর্শন করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় একান্ত আগ্রহভরে যেন প্রকৃতির এই অমৃত-সুষমা পান করিতেছিল। এ সৌন্দর্য্য তাহার পক্ষে নূতন নহে। আজ দশ বৎসর সে এই পুণ্য তপোবনের স্নেহক্রোড়ে লালিত; তথাপি এখনও সমরের মনে হয়, প্রকৃতি রাণী প্রতি উষায় নূতন সৌন্দর্য্য, নবীন সুষমার অর্ঘ্য লইয়া বিশ্বদেবতার অর্চ্চনা করিতে আসেন! এই পবিত্র-কাননে, ঐ বিহগ-কাকলীমুখর বনচ্ছায়ায় বসিয়া সে কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন অভ্যাস করিয়াছে! ঐ প্রশস্ত তৃণমণ্ডিত ভূমির উপর তাহার অস্ত্রবিদ্যা ও মল্লযুদ্ধের সহিত প্রথম পরিচয়! এই প্রস্তরাসনেই তাহার সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রথম অনুশীলন। শরতের স্নিগ্ধ মধুর প্রভাতে গুরুদেবের সম্মুখে বসিয়া সে যখন ঋষি-কবি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের অপূর্ব্ব কাব্যসুধা পান করিত, কালিদাস, ভবভূতি ও মাঘের বিচিত্র

শ্লোকরাজির ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে রত থাকিত, তখন পুষ্পগন্ধব্যাকুল পবন ঊষার কিরণ মাখিয়া তাহার গ্রন্থের পাতায় পাতায় খেলা করিত, তাহার কল্পনাকে মুখর করিয়া তুলিত। অতীতের বিশ্বপ্লাবী গৌরবভাতি বর্ত্তমানের নিবিড় তমোজাল বিদীর্ণ করিয়া ভবিষ্যতের প্রসন্ন আকাশে কখনও কি বিপুল উচ্ছ্বাসে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে না?

সমরসিংহ কল্পনার স্বপ্নে, সৌন্দর্য্যের ধ্যানে এত নিবিষ্ট হইয়াছিল যে, গুরুদেব শঙ্কর স্বামী কখন তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা সে অনুভব করিতে পারে নাই।

"সমর!"

গুরুর আহ্বানে শিষ্য চমকিতভাবে পশ্চাতে চাহিল। আত্মবিস্মৃতির জন্য লজ্জায় তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল।

স্নিগ্ধ, প্রশান্ত স্বরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বৎস, তোমার পিতা তোমাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত লোক পাঠাইয়াছেন। তোমার শিক্ষাও সমাপ্ত হইয়াছে। আমার যাহা কিছু বিদ্যা ছিল, সমস্তই তোমাকে দান করিয়াছি। এখন গৃহে যাও। তোমার পিতার এইরূপ অভিপ্রায়, আমারও আদেশ। অজয় কোথায় গেল? আহারাদির পর যাত্রার আয়োজন কর।"

শিক্ষা সমাপ্ত? মনুষ্য-জীবনে যে শিক্ষার অন্ত নাই, আজন্ম-তপস্যায়ও যে জ্ঞানসমুদ্রের রত্নরাজির আহরণ অসম্ভব, বাইশ বৎসর বয়সে সমরসিংহ সেই অনন্ত জ্ঞান রাজ্যের

অধিকারী ?—শিক্ষার সমাপ্তি ? কিন্তু গুরুদেবের আদেশ অলঙ্ঘনীয়, অবশ্যই তাহা পালন করিতে হইবে ; পিতারও তাহাই অভিপ্রেত ;—প্রতিবাদ অশোভন।

তুষারকিরীটী হিমালয় ! প্রিয়তম শৈলরাজি ! আজ এই শেষ দেখা ! কলনাদিনী জাহ্নবীর স্ফটিকস্বচ্ছ পুণ্যসলিলে আজ শেষ স্নান ! ফলপুষ্পিতা বনরাণী, তোমার স্নেহক্রোড়ে সমরসিংহ আর কি বিশ্রামশয্যা পাতিবে না ?

যুবক ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে নীল শূন্যে চাহিল। তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ওকি ? নয়নপল্লবে মুক্তা দুলিতেছে ?

"বৎস, কাতর হইও না। গীতার উপদেশ স্মরণ কর। শুধু শাস্ত্র আলোচনাই মানবের একমাত্র ধর্ম্ম নহে। কর্ম্ম দ্বারা জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে শিক্ষা ব্যর্থ। তোমার সম্মুখে বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র। এত দিন যাহা শিখাইয়াছি কর্ম্মে তাহার ফল দেখিতে চাই।"

সমর আত্মসংবরণ করিয়া যুক্তকরে বলিল, "আপনিও আমাদের সঙ্গে যাইবেন ত ? গুরু-দক্ষিণা না দিলে আমার সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হইবে।"

স্বামীজী হাসিলেন। সে হাস্য কি মধুর, কি আনন্দদীপ্ত ! শিষ্যের মস্তকে হস্ত রাখিয়া প্রীতিভরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "না সমর, আমি এখন যাইব না। প্রয়োজন বুঝিলে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আর দক্ষিণার কথা ? তুমি ত জান বৎস, সন্ন্যাসীর কোনও বস্তুতে অধিকার নাই। ধনরত্নাদির

আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে উদিত হইলেই সন্ন্যাস ব্যর্থ হয়। আমার যাহা কিছু, সমস্তই ভগবানে অর্পিত। তবে আমিও মানুষ, সুতরাং কামনাকে সম্পূর্ণ জয় করিতে পারি নাই। একটা বাসনা আমার হৃদয়কে এখনও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সে কামনা বাল্যে অঙ্কুরিত, এবং যৌবন ও বার্দ্ধক্যে ক্রমে পল্লবিত হইয়াছে। তোমার, আমার ও আমাদের সকলেরই জননী—মাতৃভূমি আমার কামনার ধন। জননীকে কখনও দেখি নাই, কিন্তু মাতৃভূমিকে জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়াছি। যে দিন হইতে জননীর সত্তা অনুভব করিতে পারিয়াছি, সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তেই সংসারের সুখভোগ বিসর্জ্জন করিয়াছি। সেই জননী, দেবীরূপা মাতৃভূমিকে আমি বড় ভালবাসি।”

সন্ন্যাসীর নয়নে কি পবিত্র আলোকদীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বুঝি কণ্ঠস্বরও একটু কম্পিত হইতেছিল। স্বামীজী বলিলেন, “বৎস, ভগবানের রূপ কল্পনা করিতে গিয়া দেখিয়াছি, মাতার বিষাদকাতর করুণ মূর্ত্তি আমার নয়নে প্রতিভাসিত হয়। বিশ্বস্রষ্টার গৌরব-কীর্ত্তন করিতে গিয়া রসনায় ভারতমাতার বন্দনাগীতি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। ঋষিবন্দিতা মাতা, সুজলা সুফলা জননী, বেদমন্ত্রপূজিতা দেশলক্ষ্মী আমার অন্তরে ও বাহিরে। বৎস, সেই গরীয়সী, লোকপালিনী জননীর পূজায় তাঁহার কল্যাণকল্পে তোমার সমস্ত সাধনা, সমগ্র শিক্ষা প্রয়োগ করিও। ইহাই তোমার গুরুদক্ষিণা। দশ বৎসর ধরিয়া এই শিক্ষা, এই ভাব তোমার হৃদয়ে সঞ্চারিত ও বদ্ধমূল

করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সমাজে ফিরিয়া যাও, মানুষের সংস্রবে জন্মভূমির প্রকৃত চিত্র, যথার্থ অবস্থা দেখিতে পাইবে। তখন, বৎস, অধীর হইও না, সে দৃশ্য দেখিয়া হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষা ও সংযমের বলে হৃদয় দৃঢ় করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রের সহস্র বিপদ ও বাধাকে বরণ করিয়া লইও। আশীর্ব্বাদ করি, আমার আশৈশব সাধনা, যৌবনের স্বপ্ন তোমার দ্বারা সার্থক ও সফল হইবে।”

“আশীর্ব্বাদের ঝুলির মুখটা কি কেবল আমার বেলাই বন্ধ, গুরুজী! দাদার মত গীতা, দর্শন কাব্য কি আমিও পড়ি নাই ঠাকুর?”

অজয় সিংহকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া শঙ্করস্বামী কিছু বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, “তুমি কোথায় ছিলে, অজয়?”

“ঐ গাছের ডালে। আপনি দাদাকে আশীর্ব্বাদ করিতে যে ব্যস্ত, আমায় দেখিতে পাইবেন কিরূপে?”

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, “অজয় চিরকাল ছেলেমানুষটির মত থাকিবে! সব সময়ে কি গাছে চড়া ভাল?”

“তা কি করিব, গুরুজী! দিনরাত গীতার শ্লোক, পাতঞ্জলের সূত্র, পাণিনির তদ্ধিত—ও সব আমার ভাল লাগে না। গাছ, পালা, পাহাড়, নদী, পাখী. ফুল,—এর কাছে কি পুঁথির লেখা? গুরুদেব, বাবা যে লোক পাঠাইয়াছেন, সে কোথায়?”

“চল, তার কাছে তোমাদের লইয়া যাই।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ণের ছায়া গাঢ়তর হইয়া আসিয়াছে। বিলাস ও লালসার লীলাক্ষেত্র, ব্যভিচার. ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার রঙ্গভূমি মোগলরাজধানী দিল্লীকে পশ্চাতে ফেলিয়া সমর ও অজয় পল্লীপথ ধরিল। আর বেশী দূর নহে। ঐ ত তাহাদের বৃহৎপুরীর শিখরদেশ সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে দেখা যাইতেছে। যান ও বাহকদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া ভৃত্যের সহিত দুই ভাই পদব্রজে চলিল। শ্যামা সন্ধ্যায় জনহীন পল্লীপথ, পথের উভয়পার্শ্বস্থ ভুট্টা, যব, গম ও ইক্ষু প্রভৃতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র উভয়ের হৃদয়ে বহুদিনের বিস্মৃত-প্রায় শৈশবস্মৃতি ফিরাইয়া আনিল। আজ দশ বৎসর পরে তাহারা সুখস্বপ্নময় বাল্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে গ্রামের সুখদুঃখের আবর্ত্তের মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছে। সরলহৃদয়, শৈশবসহচর, প্রিয়দর্শন স্নেহভীরু বৃদ্ধগণ এতদিন পরে তাহাদিগকে দেখিয়া চিনিতে পারিবে কি?

পিতার স্নেহপ্রফুল্ল সৌম্যমূর্ত্তি, দীপ্ত নয়ন, ভাবদৃঢ় মুখমণ্ডল তাহারা কতকাল দেখে নাই! মধ্যে একবার গুরুর আশ্রমে তিনি তাহাদিগকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সেও অনেক দিনের কথা। তারপর আর দেখা হয় নাই। আজ তাহারা পিতার চরণ বন্দনা করিয়া ধন্য হইবে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে! কি আনন্দ, কি উল্লাস! ভাবাবেশে সমরের হৃদয়

দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। শৈশবে তাহারা মাতৃহীন। তাঁহাকে বড় মনে পড়ে না। তখন সমরের বয়স তিন বৎসর; অজয় এক বৎসরের শিশু। পিতার স্নেহক্রোড়েই তাহারা লালিত হইয়াছিল। দাস দাসীর বাহুল্য সত্ত্বেও পিতা স্বহস্তে তাহাদিগকে খাওয়াইতেন, সঙ্গে করিয়া বেড়াইতেন। এক শয্যায় তিন জনে শয়ন করিতেন। কতকাল পরে আজ তাহারা আবার স্নেহময় পিতার অনির্ব্বচনীয় সঙ্গসুখ উপভোগ করিবে!

যখন তাহারা পুরদ্বারে পঁহুছিল, সন্ধ্যার তিমির-অঞ্চল তখন নগ্ন প্রকৃতিকে অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এত বড় অট্টালিকা এমন জনহীন কেন? একটিমাত্র দীপ-শিখাও ত দেখা যাইতেছে না। এত দাস দাসী, প্রহরী, কর্ম্মচারী, তবুও হিন্দুর গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে নাই?

"ভিখারী, বাবার কি কোন অসুখ হইয়াছিল?"

"না হুজুর! বিশ বছরের মধ্যে তাঁর কোনও অসুখই ত দেখি নাই।"

তবে ইহার অর্থ কি? এত বড় পুরী, এত লোক জন, তথাপি গৃহ শ্মশানের মত জনহীন! সমরসিংহ দ্রুতপদে সিংহদ্বার অতিক্রম করিল, কোথাও জনমানবের সাড়া নাই। উদ্বেগাকুলকণ্ঠে সে একে একে সমস্ত পুরাতন ভৃত্যের নাম ধরিয়া ডাকিল। প্রতিধ্বনি শূন্য অট্টালিকায় ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার নীরব হইল।

অতর্কিত অমঙ্গলের আশঙ্কায় তিনজনেরই হৃদয় অভিভূত হইল। বহুক্ষণ ডাকাডাকির পর দূরে একটা কম্পিত আলোক-রেখা দেখা গেল। শঙ্কাকম্পিতচরণে এক ব্যক্তি সাবধানে তাহাদের অভিমুখে আসিতেছে।

মূর্ত্তি নিকটে আসিলে প্রদীপালোকে সমরসিংহ তাহাকে চিনিতে পারিল। বৃদ্ধ তাহাদের পুরাতন ভৃত্য গোকুল দাস! কিন্তু তাহার মুখমণ্ডল এত বিবর্ণ, দেহ এত জীর্ণ কেন? দশ বৎসরে এত পরিবর্ত্তন! সমর তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল, "কি গোকুল! চিনিতে পার? বাবা কোথায়?"

বৃদ্ধ প্রদীপ তুলিয়া ধরিল। বার বৎসরের বালক এখন যুবা হইয়াছে। কিন্তু সে মূর্ত্তি কি ভুলিবার! সে যে তাহাদিগকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে!

বৃদ্ধ তখন ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বাস্পরুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "তোরা এসেছিস্? এ দিকে সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

উভয়ে চমকিয়া উঠিল। সমস্বরে বলিল, "কি হয়েছে গোকুল? বাবা কোথায়?"

"জিজিয়া, জিজিয়া!"

"জিজিয়া কি গোকুল? হেঁয়ালি রাখ, শীঘ্র বল, বাবা কোথায়?"

"জিজিয়ার নাম শুন নাই? আওরঙ্গজেবের নূতন কীর্ত্তি। হিন্দুমাত্রকেই মাথা পিছু এই কর দিতে হইবে। দুর্ভিক্ষে

মরিয়া যাও, গৃহে অন্ন থাক বা না থাক্, সম্রাটের কোষাগার পূর্ণ করিতেই হইবে।"

"জিজিয়া উৎসন্ন যাক্। বাবা কোথায়?"

বৃদ্ধ দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া বলিল, "আওরঙ্গজেবের বন্দী। তাঁহাকে সম্রাট্ ধরে নিয়ে গেছেন।"

অজয়সিংহ নিকটে সরিয়া আসিল। সমরের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। দৃঢ়মুষ্টিতে বৃদ্ধের হস্ত ধরিয়া অধীরভাবে সে বলিল, "বাবাকে ধরে' নিয়ে গেছে? কেন? সম্রাটের তিনি কি অনিষ্ট করেছেন?"

"তিনি জিজিয়া কর দিতে চান নি।"

"নিশ্চয়ই! কেন তিনি কর দিবেন? আমরা রাণা রাজসিংহের প্রজা; তাঁহাকে কর দিব কেন?"

"সম্রাট্ সে আপত্তি শুনেন নাই। মোগল অধিকারে যে হিন্দু বাস করিবে ছেলে বুড়া মেয়ে প্রত্যেককেই জিজিয়া কর দিতে হইবে। আওরঙ্গজেবের এই আদেশ। যে এই আদেশ অমান্য করিবে, তার সর্ব্বনাশ ঘটিবে। তোমার বাবা বলেছিলেন যে, ব্যবসায় উপলক্ষে সম্প্রতি সম্রাটের অধিকারে বাস করিলেও তিনি উদয়পুরের রাণার প্রজা, তিনি এই অন্যায় কর কখনও দিবেন না। সম্রাটের অনুচর বলিল, সহজে না দিলে কেমন করিয়া প্রজার কাছ থেকে কর আদায় করিতে হয়, আওরঙ্গজেব তাহা জানেন। তারপর সেনাদল আসিল; গ্রাম লুট করিল; অত্যাচারে গ্রামবাসীরা পলাইল।

তোমাদের বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া মোগল-সৈন্য যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইল। আমার তেজস্বী মনিব এই পৈশাচিক অত্যাচারে বাধা দিতে গিয়াছিলেন, তাই সম্রাটের সেনা তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে!"

পাষাণমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া সমরসিংহ অত্যাচারী সম্রাটের কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণ করিল। ক্ষোভে, ক্রোধে, দুঃখে অজয়ের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল।

"এস, দেখিবে চল" বলিয়া বৃদ্ধ সমরসিংহকে ভিতরে লইয়া চলিল। অজয় তাহাদের অনুগমন করিল।

সমস্ত কক্ষ অন্ধকার! সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা। গৃহের আসবাব-পত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ভগ্ন, অর্দ্ধভগ্ন! যেন একটা প্রলয়-ঝটিকার ভীষণ আঘাতে সমগ্র অরণ্যানী বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

তাহাদের শয়নকক্ষের প্রাচীরে জননীর একখানি চিত্রপট বিলম্বিত ছিল; ছিন্ন দীর্ণ অবস্থায় তাহা ভূমিতলে লুটাইতেছে!

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কোনও কথা কহিল না। শঙ্কর স্বামীর প্রদত্ত গ্রন্থরাশি একস্থলে রক্ষা করিয়া পরিচারক ভিখারী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। সমর নির্নিমেষলোচনে পুস্তকা-ধারটি দেখিতে লাগিল। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের, নির্ম্মম অত্যাচারের প্রতিবিধানের উপায় কি মেঘদূত, কাদম্বরী, বা উত্তররাম-চরিতের শ্লোকরাজির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে? গীতা, পূর্ব্ব-মীমাংসা, বা উত্তরমীমাংসায় এ জটিল প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব কি না, সমর কি তাহাই চিন্তা করিতেছিল?

ঊষার প্রথম আলোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সমর ডাকিল, "অজয়!" মানসিক দুশ্চিন্তাভারে ক্লান্ত হইয়া অজয়ের সবে তন্দ্রা আসিয়াছিল। ভ্রাতার আহ্বানে সে উঠিয়া বসিল।

দাদার আরক্ত মুখমণ্ডল, নয়নের অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখিয়া অজয় শঙ্কিত হইল। সমর বলিল, "ভাই, বৃথা শোকের সময় নাই। আমি এখনই এখান হইতে যাত্রা করিব। বাপার অনুসন্ধান করিব; আর যদি পারি, এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিব। ভিখারী ও গোকুল এখন নিরাশ্রয়। আজীবন তাহারা আমাদের সেবা করিয়াছে; এ বৃদ্ধবয়সে তাহারা কোথায় যাইবে? উহাদের রক্ষার ভার তোমার উপর। কিন্তু এখানে থাকিও না। উদয়পুরে, রাণার রাজ্যে ফিরিয়া যাও। সেখানে আমাদের যে সম্পত্তি আছে, তাহাতে তোমাদের সংসার বেশ চলিবে। ইতিমধ্যে যদি গুরুদেব আসেন, সব তাঁহাকে বলিও।"

সমর উঠিয়া দাঁড়াইল।

"দাদা, দাদা!"

"ছি! অজয়, তুমি কাতর হইও না। কত বড় গুরুতর কাজ, বুঝিতেছ না?"

"দাদা! তবে আমিও যাইব।"

"পাগল আর কি! তুমি গৃহে থাক; যদি আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তুমি পিতার উদ্ধারের চেষ্টা করিও। এখন যাহা বলিলাম, তাহা পালন কর।"

অজয় নীরবে নতদৃষ্টি হইয়া রহিল।

সমর সিংহ তখন জানু পাড়িয়া জননীর ছিন্ন চিত্রপটের সম্মুখে উপবেশন করিল; তার পর প্রগাঢ়ভক্তিভরে উদ্দেশে কাহাকে প্রণাম করিল।

ভ্রাতার মূর্ত্তি দূরে অন্তর্হিত হইলে অজয় ভাবিল, গৃহসুখ কি কেবল আমারই জন্য? অন্য কোনও কর্ম্মে কি আমার অধিকার নাই?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুণ্যসলিলা, কল্লোলমুখরা যমুনার তীরে স্নানার্থী হিন্দুরা দলে দলে সমবেত হইতেছিল। বহুকাল পরে কুম্ভ যোগ আসিয়াছে। দুর্ভিক্ষে শীর্ণ, অত্যাচার উৎপীড়নে জীর্ণ হইলেও হিন্দু এখনও ধর্ম্ম ভুলে নাই। তাই যমুনার পবিত্র নীরে পুণ্যস্নানের আশায় বহু দূর হইতে যাত্রী আসিয়া বিশাল প্রান্তর ছাইয়া ফেলিয়াছিল। মোগল রাজধানীর উপকণ্ঠে হিন্দুর উৎসব! বিস্ময়ের বিষয় বটে; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী আওরঙ্গজেব এই পুণ্য অনুষ্ঠানে বাধা দেন নাই।

নদীতীরে, বৃক্ষচ্ছায়ায়, রাজপথের উভয় পার্শ্বে দোকান হাট বসিয়াছে। যুবক ও বালকের জনতা হইয়াছে। হিন্দুর উৎসব দেখিবার প্রলোভনে বহুসংখ্যক মুসলমানও নদীতীরে সমবেত।

মস্তকের মূল্য।

স্নানার্থীরা অবগাহনে ব্যস্ত ; কেহ গায়ত্রী জপ করিতেছে, কেহ বা যমুনার স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে। অনেকে হাস্য পরিহাস করিয়া ও দোকানের মিঠাই কিনিয়া অর্থ ও সময়ের সদ্ব্যয় করিতেছে। ভিখারীর দল বীণা বাজাইয়া ও সারেঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া ফিরিতেছে।

অদূরে একটি ভগ্ন দেবালয়ের স্তূপশিখরে দাঁড়াইয়া ও কে? মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখর কিরণমালা তাহার প্রতিভাদীপ্ত, কমনীয় বিশাল ললাটে নৃত্য করিতেছিল। মুগ্ধ জনতা শুভ্র-বসন, উন্নতদেহ যুবকের চারি পাশে সমবেত হইল। তাহার আকৃতি কি প্রশান্ত, দৃষ্টি কি গভীর, কি উজ্জ্বল! সমস্ত কোলাহল সহসা যেন কোন মন্ত্রবলে স্তব্ধ হইয়া গেল। যুবক দৃঢ়গম্ভীরকণ্ঠে কি বলিতেছে?

ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকাহিনী? তাহা বিস্মৃতির তিমিরগর্ভে চিরসমাধি লাভ করিয়াছে! গরীয়সী মাতৃভূমির ইতিবৃত্ত? সে সব ত বিকৃতমস্তিষ্ক, মূর্খের রচিত উপকথা! ভারতবর্ষ, হিন্দুর জননী, মোগল-পাদুকা-লাঞ্ছিতা ; বীরপ্রসূ মাতৃভূমির সর্ব্বাঙ্গে লৌহবন্ধন!

কিন্তু বক্তার অগ্নিময়ী বাণী, জ্বালাময়ী ভাষা—জ্ঞানগরিমা-দৃপ্তা ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, লোকপালিনী জন্মভূমির এ কোন উজ্জ্বল চিত্র ফুটাইয়া তুলিতেছে? হিন্দুর উত্থান—আদিম মানব-সভ্যতার প্রথমবিকাশ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান ও বিদ্যার পরিপুষ্টি ; সংযম ও শিক্ষায় শক্তিশালী হিন্দু কেমন করিয়া সমগ্র বিশ্বকে

বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়াছিল, নবীন বক্তার বর্ণনাকৌশলে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। জনসঙ্ঘ মাতৃভূমির এই অপূর্ব্ব ইতিহাস, বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া বিস্মিত হইল।

যুবকের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে আরও উচ্চে উঠিল। সমুদ্র-গর্জ্জনবৎ গম্ভীর বাণী দর্শকদিগের হৃদয়ে এক অব্যক্ত শঙ্কা ও আনন্দের সঞ্চার করিল। তাহাদের মানস-নয়নে মাতৃভূমির মণিমুকুটমণ্ডিতা রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি বিচিত্র বর্ণরাগে রঞ্জিত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বিস্ময়ে হর্ষে গর্ব্বে তাহারা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

তারপর?—বক্তার স্বর আবেগে কাঁপিয়া উঠিল। তার পর হিন্দুস্থানের অনাবিল, রৌদ্রকরোজ্জ্বল নীলগগনে সহসা দিগন্তব্যাপী অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। মুহুর্মুহু বজ্রনাদ, দীপ্তদামিনীর অট্টহাস, প্রলয়-ঝটিকার ক্ষুব্ধ শ্বাস, দেব-দানবের জীবন-সংগ্রাম, ধ্বংস ও স্থিতির ভৈরব কোলাহল! আসমুদ্র হিমাচল সেই ঘোর তাণ্ডবে শিহরিয়া উঠিল।

যুবকের নয়ন জ্বলিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠস্বরে কখনও আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত উত্তপ্ত গৈরিকধারা উৎসারিত হইতেছিল; কখনও করুণ রাগিণী বাজিতেছিল; কখনও বা দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় অস্পষ্ট কোমল মধুর সঙ্গীতস্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

"হিন্দু! পবিত্র যমুনাতীরে আজ এ কিসের উৎসব? পুণ্যস্নানে দেহ পবিত্র করিবে? হা হতভাগ্য, হিন্দুর দেবমন্দির

—চিরপূজ্য বিগ্রহ প্রতিমা আজ ধূলিলুণ্ঠিত; বিধর্ম্মীর অত্যাচারে সনাতন ধর্ম্ম নিগৃহীত, ক্লিষ্ট। প্রতি পদক্ষেপে দেবতার ভগ্ন, চূর্ণ প্রতিমা পদদলিত করিয়া পুণ্যসঞ্চয়, দেব-আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে চলিযাছ? হায় ভ্রান্ত, হা হতভাগ্য ভারতবাসী!”

জনসঙ্ঘ বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহাদের হৃদয়ে রক্ত-স্রোত চঞ্চল, দেহের শিরাসমূহ স্ফীত হইয়া উঠিল। কি মর্ম্মস্পর্শিনী জ্বালাময়ী ভাষা!

“দুর্ভিক্ষপীড়িত, নিঃসম্বল, বুভুক্ষু হিন্দু! হৃদয়ের রক্ত, শরীরের অস্থিমজ্জা দিয়া যে বিশাল মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছ, মানসম্ভ্রম, অর্থ, যথাসর্ব্বস্ব বিকাইয়া মোগলের গৌরব, সম্রাটের রাজকোষ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছ, প্রাণের বিনিময়ে ভ্রাতৃহন্তা আওরঙ্গজেবকে ভারতবর্ষের স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, সেই সম্রাট্ আজ হিন্দুকে এইরূপে পুরস্কৃত করিতেছে? প্রজার গৃহে অন্ন নাই, শরীরে শক্তি নাই, ক্ষেত্রে শস্যাভাব, সম্রাট্ তাহার প্রতিবিধানে বিমুখ। দেশে অরাজকতা; উৎপীড়নে, অত্যাচারে হিন্দু উৎসন্ন হইয়াছে; আওরঙ্গজেব প্রতীকারে উদাসীন। তাহার উপর দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হিন্দুকে আবার জিজিয়া কর দিতে হইবে! না খাইয়া মর, স্ত্রী পুত্র কন্যা উপবাসী থাকুক, দুর্ভিক্ষের করাল আলিঙ্গনে পিষ্ট হও, সম্রাটের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তুমি হিন্দু—বালক, যুবা, বৃদ্ধ, বা স্ত্রী যাই হও, তোমাকে

জিজিয়া কর দিতে হইবে। সম্রাটের রাজকোষ পূর্ণ হওয়া চাই।"

"ভাই সব, এমন নির্লজ্জ অত্যাচার, অন্যায় পক্ষপাতিতা কোন্ রাজধর্ম্মের অনুমোদিত? হিন্দু না খাইয়া মরিবে, সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিবে, অত্যাচার অবিচার সহ্য করিয়া রাজভক্তির পুষ্পমাল্য সম্রাটের চরণতলে উপহার দিবে, এবং সেই সঙ্গে জিজিয়া কর নিজের মাথায় বহন করিবে? আর যে ব্যক্তি মুসলমান, তাহার গায়ে আগুনের আঁচও লাগিবে না! কি চমৎকার রাজধর্ম্ম! কিন্তু ইহার কি কোনও প্রতীকার নাই?"

যুবকের স্থির উজ্জ্বল দৃষ্টি জনতার উপর নিক্ষিপ্ত হইল।

"আছে। আজ যদি সমগ্র হিন্দু দৃঢ়স্বরে প্রতিজ্ঞা করে, আমরা এ অন্যায় কর দিব না, তাহা হইলে সম্রাটের সাধ্য নাই, এই কর আদায় করিতে পারেন। তোমরা কি সে প্রতিজ্ঞা করিবে না? আজ তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভগিনী না খাইয়া মরিতেছে, করভারে দেশের লোক পিষ্ট হইতেছে, আর তোমরা নীরবে তাহা দেখিবে?"

লক্ষ কণ্ঠ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"আমরা এ কর দিব না।"

মুসলমান দর্শকেরা চমকিয়া উঠিল। গুপ্তচর আসন্ন বিপদের আশঙ্কা করিয়া দ্রুতবেগে দিল্লীর অভিমুখে ছুটিল।

ললাটের স্বেদবারি মুছিয়া ফেলিয়া বক্তা কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইল।

মস্তকের মূল্য।

দীপ্ত মধ্যাহ্নে তাহাকে যেন কোনও অপরিচিত রাজ্যের দেবদূতের মত বোধ হইতেছিল।

কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে তুলিয়া যুবক বলিল, "তবে এস, আজ এই পুণ্যক্ষণে, তীর্থতীরে দাঁড়াইয়া আমরা সকলে শপথ করিয়া বলি, জীবন থাকিতে কেহ জিজিয়া কর দিব না। শত অত্যাচার, সহস্র উৎপীড়ন সহ্য করিব, তথাপি সম্রাটের অন্যায় আব্দার কখনই রক্ষা করিব না। শুন, ভাই সব, এই জিজিয়া করের জন্য আমার পিতা, আওরঙ্গজেবের কারাগারে, আমাদের—"

জনতা সবিস্ময়ে দেখিল, দূরে এক দল অশ্বারোহী সৈন্য উল্কার ন্যায় বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাদের কোষমুক্ত তরবারি, মার্জ্জিত আগ্নেয়াস্ত্র সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছে।

মুহূর্ত্তমধ্যে সংবাদ রাষ্ট্র হইল—সম্রাটের সৈন্য সকলকে ধরিবার জন্য আসিতেছে। তখন শান্তিপ্রিয়, সাবধান ও সতর্ক বুদ্ধিমানেরা চাণক্যনীতি অবলম্বন করিল!

যুবক নিশ্চল প্রতিমার মত ভগ্ন স্তূপশিখরে তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। পলায়নপর এক ব্যক্তি বলিল, "তুমি পালাও। ধরিতে পারিলে আওরঙ্গজেব তোমাকে হত্যা করিবে।"

কিন্তু যুবক নড়িল না। কতিপয় বলিষ্ঠ যুবক তখন তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সেনাদল ঝড়ের ন্যায় বেগে আসিতেছে। জনতা ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই পলায়নে ব্যস্ত।

এমন সময় গম্ভীরকণ্ঠে পশ্চাৎ হইতে কেহ বলিল, "সমরসিংহ, বৎস, এখনও সময় হয় নাই। অকারণ ধরা দিয়া অনুষ্ঠিত কর্ম্মযজ্ঞ পণ্ড করিও না।"

সমর চকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিল। কণ্ঠস্বর চিরপরিচিত, কিন্তু জনতার মধ্যে বক্তাকে দেখা গেল না। সমর তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে স্তূপশিখর হইতে নীচে নামিয়া আসিল। সে আদেশ উপেক্ষা করিবার নহে। জনতা যুবকের জন্য পথ করিয়া দিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমরসিংহের উন্নত দেহ লোকারণ্যে মিশিয়া গেল।

চতুর্থ-পরিচ্ছেদ।

সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের আদেশবাণী নগরে নগরে প্রচারিত হইল,—যে কেহ বিদ্রোহী যুবাকে জীবিত বা মৃত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিবে, পাঁচ হাজার আসরফি তাহার পুরস্কার! সহস্র অশ্বারোহী দ্রুতগামী অশ্বে দিকে দিকে প্রেরিত হইয়াছে। দিল্লীর সমস্ত তোরণ রুদ্ধ। সন্তোষ-জনক প্রমাণ না পাইলে রাজসৈন্য কাহাকেও বাহিরে যাইতে দিতেছে না। দিল্লীর অভ্যন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই গুপ্তচর ও সৈনাদল সতর্কভাবে বিদ্রোহীর সন্ধানে ফিরিতেছে।

মস্তকের মূল্য।

সমগ্র হিন্দুস্থানের শক্তিশালী সম্রাট্ আজ এক জন অজাত-শ্মশ্রু বালকের দুই চারিটি অগ্নিময়ী বাণীর আঘাতে এত চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন কেন? হিন্দুপ্রজা অত্যাচার ও উৎপীড়নে যে দিন দিন অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, এ সংবাদ আওরঙ্গজেবের অবিদিত ছিল না। জিজিয়া করের পীড়নে সমগ্র হিন্দুস্থানে বিরক্তি ও অসন্তোষ দিন দিন যে সন্ধুক্ষিত বহ্নির ন্যায় ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহাও তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তার পর এই অপরিণামদর্শী যুবকের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা! আসন্ন বিদ্রোহের আশঙ্কায় সম্রাট্ বিচলিত হইলেন। শত্রু ক্ষুদ্র হউক, আর প্রবলই হউক, আওরঙ্গজেবের নীতিশাস্ত্রে তাহাকে উপেক্ষা করিবার উপদেশ ছিল না।

অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। গুপ্তচর ও সেনাদলের তাড়নায় হিন্দুপ্রজা বিব্রত ও ভীত হইয়া উঠিল। প্রত্যেক পল্লী, প্রত্যেক হিন্দুর গৃহ মোগল-সৈন্যের ক্রীড়াক্ষেত্র হইল। সাধু সন্ন্যাসী, কেহই বাদ গেল না। সিপাহীরা তাঁহাদের পক্ক-শ্মশ্রু টানিয়া দেখিত, ছদ্মবেশ কি না।

সপ্তাহ অতীত হইল। কিন্তু অপরাধী ধরা পড়িল না। সিপাহীদিগের অত্যাচারে হিন্দুর অসন্তোষ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। কিন্তু যাহাকে ধরিবার জন্য এত আয়োজন, সে লোক-চক্ষুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিল। আওরঙ্গজেব অত্যন্ত বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার কঠোর আদেশ পুনরায় প্রচারিত

হইল। বিদ্রোহী নগরমধ্যেই লুকাইয়া আছে। হিন্দুর অন্তঃপুরে অনুসন্ধান কর, ছলে বলে কৌশলে, যেমন করিয়া হউক, বিদ্রোহীকে হাজির করা চাই। প্রজাশক্তির নিকট প্রবল রাজশক্তি অবনত হইবে? ভারতসম্রাট্ আওরঙ্গজেবের বাসনা অপূর্ণ থাকিবে? অসম্ভব! যেমন করিয়াই হউক, বিদ্রোহীকে চাই!

রাত্রি দ্বিপ্রহর। আসন্ন দুর্য্যোগের আশঙ্কার দিল্লীর প্রমোদ-ভবন বহুপূর্ব্বে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। বিলাসলালসামুগ্ধা, আলোকমালাময়ী নগরী তন্দ্রামগ্না।

আকাশে ছিদ্রশূন্য মেঘজাল। উন্মত্ত দৈত্যের ন্যায় ক্ষুব্ধ ঝটিকা প্রাসাদের রুদ্ধ দ্বারে ও বাতায়নে বলপরীক্ষা করিতে-ছিল। দীপ্ত দামিনীর চঞ্চল নৃত্যে, বজ্রের গুরুগর্জ্জনে সুপ্তনগরী শিহরিয়া উঠিতেছিল। ঝটিকার অঞ্চল ধরিয়া বারিধারা নামিয়া আসিল।

রাজপথ জনশূন্য; গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই ভীষণ দুর্য্যোগে গৃহের বাহির হয় কাহার সাধ্য?

এমন সময় একটি মনুষ্যমূর্ত্তি চোরের মত অতি সন্তর্পণে এক বৃহৎ অট্টালিকার পশ্চাতের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দিকে লোকজন বড় চলাফেরা করিত না। দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র উহার অর্গল মুক্ত হইল। অতি সতর্কভাবে নবাগত ব্যক্তি সাগ্রহে বলিল, "দাদা কেমন আছেন?"

মস্তকের মূল্য।

"এইমাত্র জ্বরত্যাগ হইয়াছে। এ যাত্রা যে রক্ষা পাইবে এমন আশা ছিল না। সাত দিন, সাত রাত্রি অচৈতন্য, মৃত্যুর সহিত অবিরাম যুদ্ধ!"

"গুরুজী! শেষ রক্ষা হইবে কি?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি গম্ভীরস্বরে বলিলেন. "সে আশা কই? চারি দিকে যেরূপ পাহারা, সতর্ক গুপ্তচর যেরূপ আগ্রহে অনুসন্ধান করিতেছে, তাহাতে উদ্ধারের আশা কোথায়? ওঃ! সেই রাত্রে যদি সমর পীড়িত হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে এত দিন কোথায় চলিয়া যাইতাম। সমগ্র মোগল সেনা তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিত না।"

"এখন কি কোনও উপায় নাই গুরুদেব? আজিকার এই দুর্যোগের অবসরে প্রহরীদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া কি পলায়ন করা যায় না।"

"অসম্ভব, বৎস! এই ঝড় বৃষ্টিতে বাহির হইলে সমরের মৃত্যু অনিবার্য্য। বিশেষতঃ সমর উত্থানশক্তিরহিত। ধ্রুব মৃত্যুর মুখে তাহাকে কেমন করিয়া নিক্ষেপ করিব?"

"তবে উপায়?"

"তাহাই ভাবিতেছি। মহারাজ জয়সিংহ আশ্রয় না দিলে এত দিনও সমরকে লুকাইয়া রাখিতে পারিতাম না। তিনি আমাকে যথেষ্ট ভক্তি করেন, তাই তাঁহার গৃহের এই অংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনিও জানেন না যে, আমি সমরকে এখানে লুকাইয়া রাখিয়াছি। এ স্থলও আর নিরাপদ নহে।

জয়সিংহ আগামী কল্য রাজকার্য্যোপলক্ষে দিল্লী ত্যাগ করিবেন। তখন সম্রাটের গুপ্তচর কি এখানেও সন্ধান করিবে না? জয়সিংহ আওরঙ্গজেবের দক্ষিণ হস্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্রাট্ তাঁহাকেও বিশ্বাস করেন না।"

"তাহা হইলে উদ্ধারের আর কোনও উপায় নাই?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শঙ্কর স্বামী বলিলেন, "যদি ইতিমধ্যে গৃহে গৃহে অনুসন্ধান থামিয়া যায়, দিল্লীর তোরণদ্বার পূর্ব্বের মত সাধারণের জন্য উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহা হইলে মুক্তি সম্ভব; কিন্তু বৎস, তাহা অসম্ভব। সমর সিংহ ধরা না পড়িলে অনুসন্ধান থামিবে না। সুতরাং তাহার মুক্তির আশা কোথায়?"

দিগন্ত আলোকিত করিয়া দামিনী হাসিয়া উঠিল। অজয়সিংহ মেঘমেদুর আকাশে চাহিয়া বলিল, "নিষ্ঠুর সম্রাট্ হিন্দুর প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতেছেন, দাদা কি তাহা শুনিয়াছেন?"

"না, অজয়। এ কয় দিন তাহার চৈতন্যই ছিল না। এ সব কথা শুনিলে সে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবে না। তাহার জন্য নিরীহ হিন্দু উৎপীড়িত হইতেছে জানিতে পারিলে, সে এই দণ্ডেই আত্মসমর্পণ করিবে।"

"গুরুজী! তবে তাঁহাকে ইহার বিন্দুবিসর্গও জানাইয়া কাজ নাই। দাদাকে যে কোনও রূপে বাঁচাইতে হইবে। তিনি বাঁচিলে মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল হইবে, এ কথা একদিন

আপনি নিজেই বলিয়াছিলেন। আপনি উপায় স্থির করুন, গুরুদেব!"

"উপায় ভগবান; মনুষ্যের এ ক্ষেত্রে কোনও হাত নাই।"

অজয়সিংহ নীরবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তার পর বলিল, "চলুন, দাদাকে একবার দেখিয়া আসি।"

উভয়ে ধীরে ধীরে পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। একটি সামান্য শয্যার উপর পীড়িত সমরসিংহ নিদ্রামগ্ন। তাহার মুখ মলিন পাণ্ডুরবর্ণ। অদূরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। অজয় সে দৃশ্যে বিচলিত হইল। তাহার সহোদর আজন্মের ক্রীড়াসহচর, ভ্রাতার এই দশা: আওরঙ্গজেব এই কোমল-মতি, সরল, তেজস্বী বীরের মস্তকের জন্য লালায়িত? দেশের জন্য, দশের নিমিত্ত যাহার হৃদয় উন্মত্ত, পরের দুঃখে যাহার হৃদয় পীড়িত, সেই মনস্বী মহাত্মার জীবন আওরঙ্গজেব গ্রহণ করিবে? সমরসিংহকে উদ্ধার করিবার কোনও উপায় কি নাই?

ভূমিতলে, ভ্রাতার শিয়রে অজয়সিংহ জানু পাতিয়া উপবেশন করিল। অতৃপ্তনয়নে বহুক্ষণ জ্যেষ্ঠের প্রতিভা-দীপ্ত পাণ্ডুর মুখে চাহিয়া রহিল। নিদ্রার কোমল স্পর্শে ললাটে চিন্তার রেখা মুছিয়া গিয়াছিল। বহুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া অজয় ঊর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

বাহিরে মত্তঝটিকা তখনও বেগে বহিতেছিল; বৃষ্টিধারা রুদ্ধ বাতায়নে প্রতিহত হইতেছিল।

দৃঢ়পদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে অজয় বলিল, "তবে এখন আসি, গুরুদেব। দাদাকে জাগাইয়া কাজ নাই।"

"তুমি নগরে প্রবেশ করিলে কিরূপে? কেহ দেখিতে পায় নাই?"

"না গুরুজী! রমণীবেশে যমুনার তীরপথে আসিয়াছি। সে দুর্য্যোগে প্রহরীরা দেখিতে পায় নাই।"

"কাল সকালে নগরের বাহিরে যাইব। আসিবার সময় তোমার সহিত দেখা করিয়া আসিব।"

অজয় আর একবার ভ্রাতার নিদ্রিত মূর্ত্তির পানে ফিরিয়া চাহিল। তার পর বাহিরের বারিবিদ্যুৎব্যাকুল অন্ধকারে সে অন্তর্হিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুর্য্যোগ থামিয়া গিয়াছে। প্রভাতের নবীন আলোকপ্লাবনে বর্ষাধারাসিক্ত প্রকৃতি হাসিতেছিল। দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাসে, মণিমুক্তামণ্ডিত বিচিত্র সিংহাসনে মোগল-সাম্রাজ্যের ধূমকেতু আওরঙ্গজেব উপবিষ্ট। দরবারমণ্ডপ আমীর, ওমরাহ ও অন্যান্য সভাসদে পরিপূর্ণ।

সম্রাটের মুখমণ্ডল চিন্তাক্লিষ্ট, আষাঢ়ের বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় গম্ভীর। সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহের বহ্নি ধূমায়িত

হইতেছিল। রাজসভায় ষড়যন্ত্রের অভাব ছিল না। বিদ্রোহী যুবক এখনও ধরা পড়ে নাই, তজ্জন্য তিনি এইমাত্র ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর প্রতি অতি পরুষ ব্যবহার করিয়াছেন।

নানা দুশ্চিন্তায় আওরঙ্গজেবের হৃদয় অবসন্ন ও ক্ষুব্ধ হইলেও, তিনি অতি সহজ ভাবে রাজকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। মুখ দেখিয়া তাঁহার মনোভাব অবগত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

দরবারের কার্য্য চলিতেছে, এমন সময় বহির্ভাগে একটা গোল উঠিল। সভাস্থ সকলেই এই আকস্মিক গোলযোগের কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইল। সম্রাটের ইঙ্গিতে সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ বাহিরে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন, একটি যুবক কোনও বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী, কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে আসিতে দিতে চাহিতেছে না।

সম্রাটের আদেশে সেনাপতি পুনরায় বাহিরে গেলেন। সাক্ষাৎপ্রার্থী যুবক তাঁহার সহিত দরবারগৃহে প্রবেশ করিল। আগন্তুক প্রশান্তদৃষ্টিতে একবার চারিদিক্ দেখিয়া লইল। তার পর উন্নত মস্তকে আওরঙ্গজেবের সম্মুখীন হইল। তাহার এই অশিষ্ট ও উদ্ধত ব্যবহারে সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল।

মহব্বৎ খাঁ অত্যুচ্চস্বরে বলিলেন, "যুবক, ভারতসম্রাটকে অভিবাদন করিতেছ না ?"

মৃদু হাসিয়া যুবক বলিল, "এ মস্তক যেখানে সেখানে, বিশেষতঃ অত্যাচারীর সম্মুখে অবনত হয় না।"

কথাটা উচ্চৈঃস্বরে না বলিলেও আওরঙ্গজেবের কাণে গেল। সম্রাটের রেখাঙ্কিত ললাটের শিরাসমূহ সহসা স্ফীত হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সম্রাট্ গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "বালক, তুমি সৌজন্য শিক্ষা কর নাই। এখানে কি জন্য আসিয়াছ?"

যুবক আর একবার বিরাট দরবারগৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। তার পর সমুন্নত মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "সম্রাট্, তোমার এত বড় দরবারগৃহে এমন কেহ নাই যে, আমাকে চিনিতে পারে? পাঁচ হাজার আসরফি যাহার মস্তকের মূল্য, আওরঙ্গজেবের দেওয়ান-ই-খাসে আজ তাহাকে আত্মপরিচয় দিতে হইতেছে, ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে?"

সভাস্থ সকলেই চমকিয়া উঠিল! এই তরুণ, সুন্দর যুবা বিদ্রোহী! এই বালকের বক্তৃতায় লক্ষ লক্ষ লোক উন্মত্ত হইয়াছিল? সভাস্থ সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল।

"কি ভাবিতেছ, আওরঙ্গজেব? বিশ্বাস হইতেছে না? সত্যের অনুরোধে হিন্দু মৃত্যুকে বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিতে পারে; এত কাল ভারতবর্ষ শাসন করিয়া তোমার কি সে অভিজ্ঞতা হয় নাই? আমি ধরা দিতাম না। তোমার লক্ষ সৈন্য আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিত না। কিন্তু

তোমার নৃশংস অত্যাচারে হিন্দু জর্জ্জরিত হইতেছে। আমাকে ধরিবার জন্য যে পৈশাচিক ব্যাপার চলিতেছে, তাহাতে নিরীহ হিন্দু, আমার স্বজাতি অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাই আর সহ্য হইল না। আমি ধরা দিতেছি; এখন তোমার অত্যাচারের অবসান হউক।"

আওরঙ্গজেবের আদেশে প্রহরীরা বিদ্রোহী যুবাকে বেষ্টন করিল। যুবক হাসিয়া বলিল, "যে স্বয়ং ধরা দিতে আসে, তাহাকে বন্ধন করায় বড় বীরত্ব! আওরঙ্গজেবের সাহসকে ধন্যবাদ!"

এই তীব্র শ্লেষে সম্রাটের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সক্রোধে বলিলেন, "উদ্ধত যুবক, সাবধান! তুমি রাজদ্রোহী, তোমার রাজদ্রোহের শাস্তি, প্রাণদণ্ড তাহা জান?"

উচ্চহাস্যে সভাতল মুখরিত করিয়া নির্ভীক যুবক বলিল, "জীবনের মমতা থাকিলে মোগলের দরবারে আসিতাম না। ভ্রাতৃহন্তা মোগলের নিকট আমি দয়ার প্রত্যাশা করিয়া আসি নাই।"

রূঢ়, নির্ম্মম সত্যবাক্যে সম্রাটের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "বিদ্রোহী সমরসিংহ, তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম।"

সভাস্থ সকলেই এই নিষ্ঠুর আদেশে বিচলিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ মন্ত্রী বলিলেন, "জাঁহাপানা! বালকের প্রতি এরূপ গুরু দণ্ড—"

গর্জ্জন করিয়া আওরঙ্গজেব বলিলেন, "তুমি চুপ. কর, বৃদ্ধ। আওরঙ্গজেব কাহারও পরামর্শ শুনিয়া কাজ করেন না।"

নির্ভীক যুবক স্মিতমুখে বলিল, "শুধু প্রাণদণ্ড? আমার কি অপরাধ? তুমি ভারতবর্ষের সম্রাট্, প্রজার সুখ দুঃখের নিয়ন্তা, তাহাদের শুভাশুভ তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু পবিত্র রাজধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া, ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, অবিচারে তুমি প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছ, অন্যায় করভারে দরিদ্র প্রজার সর্ব্বনাশ করিতেছ। মূর্খ প্রজার পক্ষ লইয়া তাই আমি তোমার ঘোরতর অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম! হায়! ভ্রান্ত, অত্যাচারে কি রাজ্য রক্ষা হয়, প্রজাদলনে কি শান্তি ফিরিয়া আইসে?"

আওরঙ্গজেবের দেহ ক্রোধে কাঁপিতেছিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মহব্বৎ খাঁ, দুর্ব্বৃত্তকে এখনই এখান হইতে লইয়া যাও। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে উহার মৃত্যুসংবাদ আমি শুনিতে চাই। নগরে ঘোষণা করিয়া দাও, যেখানে দাঁড়াইয়া শয়তান প্রথম বিদ্রোহবাণী প্রচার করিয়াছিল, সেই-খানেই উহার প্রাণদণ্ড হইবে। মৃতদেহের কেহ সৎকার করিতে পারিবে না। শৃগাল কুক্কুর উহার শব ভক্ষণ করিবে।"

যুবকের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। সে উচ্চকণ্ঠে বলিল, "আওরঙ্গজেব! তুমি ভারতবর্ষের বিধাতা হইতে পার, কিন্তু দুনিয়ারও এক জন মালিক আছেন। তাঁহার দরবারে এক-দিন তোমাকে এই সকল অত্যাচারের জবাব দিতে হইবে।

ভাবিও না তুমি রাজা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবে। মূর্খ, বলের দ্বারা দেহের শাসন করা যায় বটে, কিন্তু বিদ্রোহীর হৃদয়কে দমন করিবে কিরূপে? পাশব-শক্তি বলে এত বড় একটা জাতিকে কখনও বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। তোমার ধ্বংসের জন্য ভগবানের বজ্র উদ্যত। মারাঠার অস্ত্রপ্রহারে মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়াছে; প্রজার উপর অত্যাচারে একদিন তাহা ধূলিসাৎ হইবে।"

ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার আকাশে সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখা মিলাইয়া গেল। শোকমুগ্ধ দিল্লীবাসী ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিল। পুরাতন যায়, নূতন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। জীর্ণ, পুরাতন দিবস চলিয়া গেল, নূতন রজনী আসিতেছে, কিন্তু অন্ধকারের মধ্য দিয়া।' "

বিদ্রোহীর প্রাণশূন্য দেহের উপর দিয়া তরুণ সন্ধ্যার বাতাস বহিয়া গেল।

ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের উপর একটি বৃক্ষকাণ্ডে মৃতদেহ দুলিতেছিল। আকাশ, কানন, নদীতীরস্থ গাছপালার অন্তরাল হইতে তিমির-যবনিকা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছিল। সহসা গাঢ় অন্ধকারে দিগন্তরেখা মুছিয়া গেল। আর

কিছু দেখা যায় না। প্রান্তর, অরণ্য, ও নদী সব এক হইয়া গিয়াছে।

ও কি? মনুষ্য-পদশব্দ! ভীষণ নীরব শ্মশানে এ সময়ে কে আসে? দ্রুত, কম্পিত, অধীর পদধ্বনি! বিস্তীর্ণ অন্ধকারময় প্রান্তর! সম্মুখে দোদুল্যমান মৃতদেহ! পিশাচের রঙ্গভূমি! এখানে মনুষ্যের নিশ্বাস, উষ্ণরক্তের খরপ্রবাহ?

"কৈ, কোথায়?"

কণ্ঠস্বরে কি যন্ত্রণা, কি ব্যাকুলতা! এ বিরাট শ্মশানে কে তুমি?

এক বক্তি ইষ্টকস্তূপের উপর উঠিল। ব্যাকুলভাবে যেন কি অন্বেষণ করিতে লাগিল। এ কি! তরবারির সাহায্যে শবের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে?

আগন্তুক দুই বাহু দ্বারা ছিন্নবন্ধন শবদেহ আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল; তার পর ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া মর্ম্মভেদী আর্ত্তস্বরে বলিল, "প্রাণাধিক, ভাই আমার, তোমার এই দশা! আওরঙ্গজেবের মৃত্যুবাণ বুক পাতিয়া লইয়াছ! ভ্রাতার জীবনরক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করিয়াছ? গুরুদেব! কেন আপনি আমাকে আগে সব বলেন নাই?"

সে মর্ম্মভেদী বিলাপে মোহবর্জ্জিত সন্ন্যাসীর হৃদয়ও বিচলিত হইল। তাঁহার নয়নপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল; তিনি বলিলেন, "আমি জানিতাম না। প্রত্যূষে নগরের বাহিরে গিয়াছিলাম। "অপরাহ্ণে অজয়ের সহিত দেখা করিবার

কথা ছিল। সেখানে গিয়া তাহার দেখা পাইলাম না; আমার জন্য সে একখানি পত্র রাখিয়া গিয়াছিল। পাঠ করিয়া সমস্ত বুঝিলাম। দ্রুতপদে নগরে প্রবেশ করিয়া শুনিলাম, বিদ্রোহী সমর সিংহের প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে। আমি জানিতাম না, এই চপলমতি বালকের হৃদয় এত মহান্, এত গভীর! সে জানিত, সমরসিংহ বাঁচিয়া থাকিলে দেশের অনেক কাজ হইবে; কিন্তু সমর ধরা না পড়িলে সমরসিংহের মুক্তি নাই! তাই আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। ধন্য অজয়, সার্থক তোমার জন্ম! তোমার মত শিষ্য পাইয়া আমিও আজ ধন্য।”

গুরুর কম্পিত কণ্ঠস্বরে শোকমুগ্ধ যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে ভ্রাতার মৃতদেহ। যাহার জন্য আজ সে ভ্রাতৃহীন, সে ত এখনও জীবিত। তাহার মত আরও কত হতভাগ্য এই হৃদয়হীন সম্রাটের অনুগ্রহে ভ্রাতৃহীন হইবে। ইহার কি কোনও প্রতীকার নাই?

উত্তেজনার আতিশয্যে সমরসিংহের দুর্ব্বল দেহ আন্দোলিত হইতে লাগিল।

যথেচ্ছাচার নিষ্ঠুর সম্রাট্ তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, অবিচারে পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে, তার পর ভ্রাতার জীবনও গ্রহণ করিল। প্রতিদিন অসংখ্য হিন্দু মৃত্যুরও অধিক নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে। দেশের সর্ব্বত্র পুঞ্জীভূত অত্যাচার! বিধাতার বিধানে কি এই যথেচ্ছাচারের কোনও শাস্তি নাই?

আকাশের বজ্র, দেবতার অভিশাপ কি কেবল দুর্ব্বলের মাথার উপরই উদ্যত থাকিবে?

তাহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল। দন্তে দন্ত নিষ্পিষ্ট করিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, "সমগ্র হিন্দুস্থানে আগুন জ্বালাইব। গুরুদেব! এতকালের শিক্ষা শুধু নিষ্ফল বিলাপের জন্য নহে। আর নিষ্ক্রিয় থাকিব না। অগ্নিময়ী কবিতায় দেশের জীবন-বহ্নি প্রজ্বলিত করিব। দিন নাই, রাত্রি নাই, মোগলের অত্যাচারকাহিনী প্রত্যেক হিন্দুর কর্ণে ভৈরব রাগে ধ্বনিত করিব। পর্ব্বত প্রান্তর, কানন নগর, গ্রাম ও পল্লী কি সমরসিংহের জ্বালাময়ী ভাষায় জাগিয়া উঠিবে না? কখনও যদি এই দাম্ভিক আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য সিন্ধুর জলে নিক্ষেপ করিতে পারি, অজয় সিংহ, তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর কিছু প্রতিশোধ হইবে। আওরঙ্গজেব! সুখে নিদ্রা যাও; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, বিধাতার ন্যায়ের রাজ্যে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। গুরুদেব, আপনার শপথ, হিন্দুকে জাগাইব, দেশে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিব; যদি না পারি, পিতা ও ভ্রাতার হত্যার পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে। জননী জন্মভূমি! তোমার মলিন মুখে উষার স্নিগ্ধ হাসি আবার ফুটিবে কি?"

* * * * *

বর্ষব্যাপী আয়োজনের পর রাজবারায় মোগল ও রাজপুত শক্তির বলপরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। রাণা রাজসিংহের

সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আওরঙ্গজেব যে সন্ধি করিলেন, তাহাতে জিজিয়া করের মূলে কুঠারাঘাত হইল।

সম্রাট্ বাধ্য হইয়া বন্দীদিগকে মুক্তি দিলেন।

সে দিন পূর্ণিমা। উদয় সাগরের তীরে বস্ত্রাবাসের বাহিরে পিতা পুত্রের মিলন হইল। রাণা রাজসিংহ সমর সিংহের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "যুবক, আজ এই আনন্দের দিনে তোমার সেই গানটি একবার গাও। রাজপুতের হৃদয়ে তুমিই নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছ।"

গান শেষ হইলে সামন্তগণ স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেল। রাজসিংহ প্রীতমনে গায়ককে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন।

পুত্রের মুখপানে চাহিয়া পিতা বলিলেন, "অজয় কোথায়, সমর? তাহাকে দেখিতেছি না কেন?"

সমরের মুখ মলিন হইয়া গেল! অশ্রুসিক্তনেত্রে সে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কি দেখাইল।

"ভ্রাতার জন্য অজয় প্রাণ দিয়াছে; কিন্তু তাহার মস্তকের মূল্য যে এত অধিক, আওরঙ্গজেব তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই।"

অশ্রুবিন্দু মুছিয়া ফেলিয়া পিতা পুত্রকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, "অজয় নাই; কিন্তু তোমার হৃদয়ে আজ আমি উভয়ের প্রাণস্পন্দন অনুভব করিতেছি। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য অজয় প্রাণ দিয়াছে, এই পবিত্র দিনে তাহার জন্য শোক করিব না।"

প্রতিদ্বন্দ্বী।

(১)

"বাঃ কি সুন্দর !"

"চমৎকার ! সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। গল্পাংশ অতি মনোরম !"

"যতীনবাবু, আপনি মাঝে মাঝে কবিতাই লিখ্‌তেন জান্‌তুম। গদ্যে এবং গল্প লেখায় আপনার এমন সুন্দর হাত আসে, এ ধারণা ছিল না।"

বন্ধুত্রয়ের প্রশংসাকূজনে আমার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয় উল্লাসে ধ্বনিত, স্পন্দিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল।

আল্‌বোলার নলটি নামাইয়া রাখিয়া এই সময় বিপিন বিহারী ঈষৎ আবেগের সহিত সকলের মন্তব্যের উপর বলিলেন, "আপনারা না জানিতে পারেন; কিন্তু যতীন্‌কে আমি বেশ জানি। ছেলে বেলার খেলার সাথী কিনা! বরাবরই জানি, যতীনের মাথার মধ্যে কল্পনা কেবল স্বপ্ন জমা করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহাদের সংস্কার, প্রতিভা কেবল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল চাপরাশ দেখিয়া ভজনা করে তাঁহাদের সহিত আমার চির বিরোধ।"

আমার গর্ব্বস্ফীত হৃদয়ের উপকূলে উত্তাল আনন্দ-তরঙ্গ ঘন ঘন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিশ্ব-বিদ্যামন্দিরের প্রবেশ-

দ্বার হইতে পাঁচবার যে ব্যর্থমনোরথে ফিরিয়া আসিয়া ছিলাম, স্মৃতির সেই শক্তি-শেল-ক্ষতে প্রশংসার বিশল্যকরণী আজ অমৃত-ধারা ঢালিয়া দিয়া গেল।

আমি বলিলাম, "কিছু যদি মনে না করেন, তা হ'লে রাত্রের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা এই খানেই—"

বিপিন বিহারী উঠিয়া বসিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "বিলক্ষণ! তার জন্য এত অনুনয় কেন? তোমার এখানে আর বাড়ীতে তফাৎ কি?"

(২)

সাধারণ মানব হইতে কবির আসন অনেক উর্দ্ধে। কাব্য জগতের একটা তীব্র নেশা আমায় মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল। চক্ষের উপর কেবল স্বপ্ন, কানের ভিতর কেবল গুঞ্জন, আর বুকের মধ্যে কেবল স্পন্দন জটলা করিতে লাগিল। তরল নেশার স্বচ্ছ যবনিকা খানি মাঝে মাঝে যখন চক্ষুর উপর হইতে একটু সরিয়া যাইত, তখন বাহ্য জগতের মানুষগুলার শুষ্ক কঠোর কার্য্য কলাপ দেখিয়া একটা ব্যথিত হাস্য আমায় ব্যাকুল করিয়া তুলিত। হায়, কর্ম্মান্ধ মানব! কাব্যরসের মধুর আস্বাদে যাহারা বঞ্চিত তাহাদের মনুষ্য জন্ম ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে!

পাড়ার একখানা নূতন মাসিক পত্র বাহির হইতেছিল। নব সম্পাদকের গুঞ্জন-গীতি আমার কুঞ্জদ্বার মুখরিত করিয়া

তুলিল। শুধু কি কাব্যকুসুমের মধু লোভে? অতিথি-সংকারের পক্ষপাতী কখনও ছিলাম না; কিন্তু প্রার্থী এ ক্ষেত্রে বিমুখ হইলেন না। কাব্যরসের সহিত রজতচক্রের সমাবেশ রাসায়নিক ক্রিয়া করে। দক্ষিণান্তে সম্পাদক মহাশয়ের মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

আমার কল্পনাপ্রসূত মৌলিক ও মনোরম রচনা কুসুম গুলি নব মাসিকের মসৃণ, চিক্কণ দেহের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষরগুলি নিশ্চয়ই যাদু জানে!

(৩)

বন্ধু বলিলেন, "তোমার গল্পের সমালোচনা 'কল্পলতায়' বেরিয়েছে যে।"

"কল্পলতায়" বাহির হইয়াছে! সুদূর আকাশ-প্রান্ত, উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ ও প্রবাহিত সমীরণের মধ্য হইতে একটা সুপ্ত সঙ্গীত সহসা যেন মন্ত্রবলে জাগিয়া উঠিল।

নেশার আবেগ ও আনন্দ উচ্ছ্বাস সংযত করিয়া যথা সম্ভব গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলাম, "বেরিয়েছে নাকি?"

বন্ধু বলিলেন, "তুমি এখনও দেখ নাই? বড় তীব্র সমালোচনা হয়েছে। একটা জমকাল রকমের প্রতিবাদ আবশ্যক।"

পৃথিবীটা যে লাটিমের অপেক্ষাও দ্রুতবেগে ঘোরে এবং তাহার আবর্ত্তনবেগ চর্ম্মচক্ষেও বেশ স্পষ্ট দেখা

যায়, জিওগ্রাফীতে তৎসম্বন্ধে একটা ফুটনোট দেওয়া আবশ্যক।

বন্ধু বলিলেন, "শীতের দিনেও তোমার ঘাম হয় না কি? পাখা দিব?"

আমি রুমালে মুখ মুছিয়া লইয়া বলিলাম, "না, পানটাতে সুপারির পরিমাণটা কিছু বেশী হইয়াছে। আজ বড় কাজ আছে, এখন আসি।"

"কল্পলতার" আমিও একজন গ্রাহক ছিলাম। পত্রিকা খানি অনেক দিনের এবং গুণানুসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই একটা প্রতিপত্তি ছিল।

বাড়ী আসিয়া সর্ব্বাগ্রে পত্রিকা খানির সমালোচনা অংশ টুকু কম্পিত হৃদয়ে পাঠ করিলাম। হায়, নিষ্ঠুর সমালোচক! কবির কাব্য-কুসুম তোমাদের তীক্ষ্ণ-মুখ লেখনীর তীব্র আঘাতে ছিন্ন হইয়া যায়! তোমাদের হৃদয়ে কি এতটুকু উদারতা, এক বিন্দু সহৃদয়তা নাই! ভাষার উপর যদি এতটুকু পর্দ্দা রাখিয়া বলিতে, প্রকাশ্য তস্কর উপাধির পরিবর্ত্তে যদি লিখিতে, অমুক ফরাসী ঔপন্যাসিকের অমুক গল্পের সহিত ইহার সাদৃশ্য বড় ঘনিষ্ঠ, ভাব ও ভাষার ঝঙ্কারের মধ্যেও বর্ত্তমান ও পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের যথেষ্ট অনুকরণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তোমার বক্তব্যও বলা হইত, অথচ লেখকের হৃদয়ে নিদারুণ, মর্ম্মান্তিক ব্যথা লাগিত না।

মিথ্যা বলিবনা, দুঃখে, কষ্টে আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

বন্ধুর উপদেশ মত এবার কার্য্য করিতে পারিলাম না। তীব্র প্রতিবাদ অপেক্ষা অন্য একটা প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন এ ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী হইবে বলিয়া বোধ করিলাম।

(৪)

বেলা দ্বিপ্রহরে আমার প্রকাণ্ড জুড়ি "কল্পলতা" কার্য্যালয়ের দ্বারে আসিয়া লাগিল। ইচ্ছা করিয়াই আজ বেশ বিন্যাসের পারিপাট্য ও মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিলাম। বাহিরের চাক্‌-চিক্যের এমন একটা প্রভাব আছে, যাহাতে মানুষের সম্ভ্রমবৃদ্ধি অতি সহজে সম্পাদিত হয়।

একটা ভৃত্য দরজার পার্শ্বে বসিয়া ঢুলিতেছিল। প্রশ্নের উত্তরে জানিলাম, সম্পাদক মহাশয় ভিতরেই আছেন।

অনতিবৃহৎ প্রকোষ্ঠমধ্যে, স্তূপাকার কাগজ পত্রের সম্মুখে এক ব্যক্তি বসিয়া ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কা'কে খোঁজেন?"

আমি বলিলাম, "আপনার বহুমূল্য সময়ের খানিকটা নষ্ট করিলাম, মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনার সুবিখ্যাত পত্রের গ্রাহক হইতে চাই। প্রথম হইতে বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত পাইতে পারি কি?"

ভাবিয়াছিলাম, প্রথম পরিচয়টা কাব্যরসে অভিসিক্ত করিয়া বেশ একটু মোলায়েম করিয়া লইব। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের বিপুল শ্মশ্রুল মুখমণ্ডল এবং গাম্ভীর্য্যের মাত্রাধিক্য দেখিয়া

আগাগোড়া সব গোল হইয়া গিয়াছিল। ভ্রমটা ক্রমশঃ সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয় আমাকে একটা বড়দরের লোক ভাবিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার বাহ্যেন্দ্রিয়ে বিস্ময়ের বিশেষ কোন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ করে নাই, কিন্তু ব্যবহারে বুঝিলাম তিনি আমাকে একটু সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেছেন।

অর্দ্ধদণ্ডের আলাপে সম্পাদক মহাশয়কে জানাইয়া দিলাম; কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজনীতি এবং পলিটিক্স সকল বিষয়েই আমার কিছু কিছু দখল আছে। কিন্তু আমি যে, কোন নবপ্রচারিত মাসিকপত্রের কবিতা ও গল্পলেখক এবং একদিন তাঁহার কঠিন সমালোচনাদণ্ডে বিলক্ষণ তাড়িত হইয়াছিলাম সে কথাটা একেবারে চাণক্যশ্লোকের উপদেশ অনুসারে চাপিয়া গেলাম।

(৫)

মানব-বশীকরণ-ব্যবস্থাশাস্ত্রে যতপ্রকার প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে, উদর দেবতাটীকে তুষ্টকরা তন্মধ্যে প্রকৃষ্ট ও সুন্দর উপায়। বন্ধু বান্ধবের অগোচরে কল্পলতাসম্পাদকের উপর এই অব্যর্থ ঔষধটী প্রয়োগ করিতে লাগিলাম।

চেষ্টা ব্যর্থ হইল না। বুঝিতে পারিলাম, সম্পাদক মহাশয় নিতান্ত মিতভাষী হইলেও, আমার প্রতি তাঁহার একটা শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঞ্চার হইতেছে।

কথাটা ক্রমশঃ বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে জানাইলাম, "কল্পলতা"—সম্পাদক আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু, তাঁহার শুভাগমনে আমার গৃহ প্রায়ই পবিত্র হয়। এবং শীঘ্রই তাঁহার লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিকে আমার আবির্ভাব সঙ্ঘটিত হইবে। বিনয় ও গৌরবের সহিত ইহাও জানাইলাম, আমার লেখার প্রতি সম্পাদক মহাশয়ের একান্ত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। ভবিষ্যতে আমার লেখা যে বাঙ্গালা ভাষার সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে পারিবে সে সম্বন্ধেও তাঁহার বিলক্ষণ ভরসা হইতেছে। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা অবশ্যই এ সংবাদে খুব আহ্লাদিত হইলেন।

এখন কতকগুলি নবীন কবি ও ঔপন্যাসিকের কবিতা ও গল্প লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলাম। যখন সম্পাদক মহাশয় এত খাতির যত্ন করেন, তখন অবশ্যই আমি চেষ্টা করিলে তাহাদের রচনা "কল্পলতায়" প্রকাশিত হইতে পারে।

আমি গম্ভীরভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম, "কল্পলতায়" লেখা বাহির করা সহজ নহে। একটু বিশেষত্ব না থাকিলে কোনও রচনা তাহাতে প্রকাশিত হয় না। আরও বুঝাইলাম, ছন্দ ও মিল থাকিলে পদ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা কবিতা নহে। উপাখ্যান মাত্রকেই ছোট গল্প বলা যায় না। ছোট গল্পে নাটকীয় অভিব্যক্তি ও সেই সঙ্গে 'আর্টের' সমাবেশ, দুই একটা 'টচ্' থাকা আবশ্যক। যাহাতে এই সকল গুণের অভাব, সাহিত্যের অঙ্গ হইতে তাহাদিগকে ছাঁটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

সুতরাং উহাতে যাহার "ন্যাক্" নাই তাহার চেষ্টাকরা বাতুলতা মাত্র। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নবীন লেখকেরা ক্রমশঃ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আমিও হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

(৬)

পূজার বন্ধে বন্ধুবান্ধবেরা কেহ দার্জ্জিলিং, কেহ মসৌরী, কেহবা ওয়ালটেয়ারে যাইতেছেন। বৈদ্যনাথে আমাদের একটা বাড়ী ছিল। বাড়ীর মেয়েরা ধরিয়া বসিল সেইখানে যাইতে হইবে।

ভাষার ঝঙ্কার, বর্ণনা ও ভাবের সমাবেশে কায়দা করিয়া একটা গল্প লিখিয়াছিলাম। পূজার সংখ্যায় প্রকাশের জন্য গল্পটি "কল্পলতা"-সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

বৈদ্যনাথে আসিয়া অনেকগুলি সাহিত্যসেবীর সহিত নূতন পরিচয় হইল। কোন কাজ ছিল না। সকাল ও সন্ধ্যায় বন্ধুদের সহিত কাব্য সাহিত্য আলোচনায়, আমোদ আহ্লাদে দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইত।

নব পরিচিত মন্মথনাথ সর্ব্বদা আমার বাসায় আসিতেন। লেখক না হইলেও সাহিত্যচর্চ্চায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখিলাম। অবসর সময়ে, নিরালায় উভয়ে সাহিত্য বিজ্ঞানের আলোচনা করিতাম।

মন্মথনাথ বড় নিরীহ প্রকৃতির। তিনি আমাকে যেন একটু সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন। আমার বক্তব্য বা মন্তব্যের

বিরুদ্ধে কোনও দিন তিনি একটিও প্রতিবাদ করিতেন না। এই নির্ব্বাক্ শ্রোতাটিকে পাইয়া আমার বক্তৃতা-স্রোত আরও প্রবল হইয়া উঠিত।

আমি কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতাম, আমাদের দেশে প্রকৃত সমালোচকের একান্ত অভাব। কাব্য বুঝে এমন একটি সমালোচকও বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে আছে কি না সন্দেহ। যেটি যত অস্পষ্ট, যাহার অর্থ সহজে অনুমেয় নয়, আমাদের দেশের লোকে সেই কবিতারই আদর করে। এই দেখুন না কেন, আমাদের বর্ত্তমান সময়ে লোকে যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে, তাঁহার—কবিতাটির কোনও অর্থ নাই। অথচ সকলে একবাক্যে তাহার প্রশংসা করিতেছে। মেঘদূত খানা পড়ি নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস কবিতাটি কালিদাসের বর্ষা-বর্ণনার পুনরুক্তি মাত্র ইত্যাদি।

আমার অনুভূতি শক্তির গভীরতার পরিমাণ করিয়া মন্মথ-নাথের চক্ষুযুগল বিস্ময়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। আমার পাণ্ডিত্যে লোকটি নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইয়াছিল।

"মন্মথ বাবু, আপনি লেখেন না কেন? সাহিত্যে আপনার অনুরাগ আছে, চেষ্টা করিয়া দেখিলে পারেন।"

মন্মথনাথ বলিলেন, "লেখার ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত, সকলের কি সে সৌভাগ্য হয়!"

আমি ভাবিলাম, কথাটা মিথ্যা নহে। মাজিয়া ঘসিয়া রূপ ও ধরিয়া বাঁধিয়া ভালবাসার মত বটে!

(৭)

বেলা আটটার সময় আমাদের গাড়ী ত্রিকূট পাহাড়ের নীচে আসিয়া থামিল। নরেন্দ্র ভায়া মেয়েদের পথিপ্রদর্শক স্বরূপ একদিক দিয়া পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল। আমি স্নিগ্ধ প্রভাতের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যটুকু নির্জ্জনে উপভোগ করিবার জন্য আর একদিক দিয়া উঠিতে লাগিলাম। তখনও পাহাড়-গাত্র-সংলগ্ন কুহেলিকার ধূম্রদেহ তরুণ আলোকস্পর্শে সম্পূর্ণ গলিয়া যায় নাই। নগ্ন আকাশ, মুক্ত প্রকৃতি শরতের শুভসুন্দর মূর্ত্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।

"আপনিও এখানে, যতীন বাবু?"

সবিস্ময়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, মন্মথ নাথ! আমি বলিলাম, বাড়ীর সকলের সাধ পাহাড় দেখিবেন, তাই তাঁহাদের লইয়া আসিয়াছি; কিন্তু আপনি এখানে যে?"

মন্মথ বাবু বলিলেন, "এ জায়গাটা বড় নির্জ্জন, বড় মনোরম। বৈদ্যনাথে আসিলেই একবার এখানটা দেখিয়া যাই।"

"আপনার হাতে ওখানা কি?"

স্মিত হাস্যে তিনি বলিলেন, "আশ্বিন সংখ্যা কল্পলতা!"

"পূজার 'কল্পলতা'? কবে পেয়েছেন?"

"কাল পেয়েছি। আপনিও একজন গ্রাহক নাকি?"

"শুধু গ্রাহক! আমার একটি গল্প এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইবার কথা। দেখুন দেখি, গল্পের নাম—"সুধা না গরল!"

আমার বক্ষ ঘনঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল।

"আপনার গল্প আছে নাকি?"

মন্মথনাথ দ্রুত অঙ্গুলি-সঞ্চালনে সূচীপত্রটা দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "আপনি দেখুন দেখি, আমিত খুঁজিয়া পাইলাম না।"

মন্মথবাবু পত্রিকা খানি আমার হস্তে প্রদান করিলেন। কি আশ্চর্য্য! আমার গল্প গেল কোথায়? একটা গল্প আছে বটে, কিন্তু লেখকের নাম ত অনাদিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়! একখানা শিলার উপর আমি ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলাম। শরৎ প্রভাতের সে নির্ম্মল, উজ্জ্বল দৃশ্য সহসা যেন আমার চোখের উপর দিয়া ছায়ার মত মিলাইয়া গেল। সিগারেট জোরে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "আজ কাল রেধো মেধো সবাই লেখক। এ গল্পে আছে কি? না আছে ভাষার ঝঙ্কার, না আছে ভাব বা বর্ণনার বৈচিত্র্য! নিশ্চয়ই কোন ইংরাজী গল্পের অনুবাদ। সম্পাদক মহাশয় কেন এমন রাবিশ রচনা ছাপিলেন বলিতে পারি না। দিন দিন কাগজ খানি অবনতির পথে চলিয়াছে।"

মন্মথ বাবু তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু যুগল তুলিয়া আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া ছিলেন। সবিস্ময়ে তিনি বলিলেন, "বলেন কি যতীন বাবু, গল্পটা ইংরাজী গল্পের নকল নাকি?"

আমি বলিলাম, "তাহাতে আর সন্দেহ আছে? এ রকম কল্পনা ইংরাজী বা ফরাসী সাহিত্য ব্যতীত আমাদের মস্তকে কখনই আসিতে পারে না! যদিও ঠিক কোন্ গল্পের অনুবাদ

তাহা স্মরণ হইতেছে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস যেন এইরূপ একটা গল্প কোথায় পড়িয়াছি। অন্ততপক্ষে কোন পুস্তকে নিশ্চয়ই এইরূপ গল্প আছে।"

মন্মথনাথ বলিলেন, "চলুন. ঐ দিক্‌টা দেখে আসি। ঝরণার জলের উপর সূর্য্যরশ্মির কি সুন্দর নৃত্য, দেখুন!"

"আপনি যান্। আমার শরীরটা বড় ক্লান্ত বোধ হইতেছে এই খানে একটু বসি।"

"আসল কথা, এখন একটু নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে ইচ্ছা করিতেছিল। হায়! সম্পাদক মহাশয়, এ কি করিলে? আমি যে বড় আশা করিয়া ছিলাম! এখন বন্ধুদের নিকটে মুখ দেখাইব কিরূপে?

(৮)

পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। সকলের ইচ্ছা বড় রকমের একটা ভোজ হয়। আমারও তাহাতে বিলক্ষণ সম্মতি আছে। আমার যে সকল বড় বড় সাহিত্যসেবীর সহিত পরিচয় হইয়াছিল, সকলকে নিমন্ত্রণ করিলাম। "কল্পলতা" সম্পাদককে আসিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিলাম। যাহারা আমায় সাহিত্য-সেবক বলিয়া অলক্ষ্যে বিদ্রূপ করিত, এবার তাহাদিগকে দেখাইয়া দিব, বঙ্গের বড় বড় কবি দেশ-বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও প্রসিদ্ধ লেখকদিগের সহিত আমার কিরূপ হৃদ্যতা।

প্রতিদ্বন্দ্বী।

গাড়ী হইতে নামিতেছি সহসা দেখিলাম, বৈদ্যনাথের সেই মন্মথবাবু আসিতেছেন।

শুনিলাম তাঁহার মাতুলালয় ভবানীপুরে—আমাদেরই পাড়ার নিকট। তিনি আজ কয়েক দিবস মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছেন।

আমি বলিলাম, "দেখা হইয়া ভালই হইল। কাল সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় আসিবেন। অনেকগুলি সাহিত্যিক বন্ধু কাল আমার ওখানে শুভাগমন করিবেন।"

একটু চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, চেষ্টা করিব।"

আমি বলিলাম, "রাস্তায় বলাটা সঙ্গত হইল বলিয়া মনে হইতেছে না, চলুন আপনাদের বাসায় গিয়া বলিয়া আসি।"

মন্মথবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "থাক্, অনর্থক কেন কষ্ট করিবেন। আমার সঙ্গে লৌকিকতা করার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমি কাল আসিব।"

বৈদ্যনাথের ত্রিকূট পাহাড়ে, মন্মথনাথের সমক্ষে আমার যে দৈন্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার তীব্র স্মৃতি সহস্র চেষ্টাতেও ভুলিতে পারি নাই। সেই দৈন্য কি দূর করিতে পারিব না? আশ্বিনের "কল্পলতায়" আমার গল্প প্রকাশিত না হইয়া কোন্ এক নগণ্য অনাদিচরণের গল্প স্থান পাইয়াছিল, সেটা সম্পাদক মহাশয়ের ভ্রম বশতই ঘটিয়াছিল, প্রকারান্তরে সে কথাটা মন্মথবাবুকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। সংবাদপত্র সমূহে সেই তুচ্ছ গল্পটার অত প্রশংসা যে কেবল, লেখকের

তৈল মর্দ্দনের ফল এবং সে স্থলে আমার গল্পটি প্রকাশিত হইলে উহা অপেক্ষা সহস্রগুণ প্রশংসা লাভ করিত, এ চিন্তাটা সর্ব্বদাই আমায় পাগল করিয়া তুলিত।

(৯)

সমস্ত দিন আমার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না। ঘরগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া কবিকুঞ্জে পরিণত করিলাম। দেখিবা মাত্র লোকে যেন বুঝিতে পারে, গৃহস্বামী একজন শিল্পী, একজন কবি।

সন্ধ্যার প্রারম্ভেই নিমন্ত্রিত বন্ধুদিগের আগমন হইতে লাগিল। আজ আমার গর্ব্ব ও আনন্দ রাখিবার স্থান কোথায়? লোকে যাঁহাদের আরাধনা করিয়া দেখা পায় না, সরস্বতীর সেই সকল বর পুত্র আজ আমার গৃহে সমবেত!

গীত বাদ্য, হাস্য পরিহাস ও তাম্রকূটের ঘনায়িত ধূমে, গন্ধমাল্যের সৌরভে, আলোকের ঔজ্জ্বল্যে, কক্ষটি এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিল। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নানাবিধ, সরস, জটিল, ছোট বড় কথার গুঞ্জন ও গর্জ্জনে সান্ধ্যসম্মিলন একটা বিচিত্র রাগরাগিণী-পূর্ণ সঙ্গীতের মত, শব্দময় সমুদ্রের মত উদ্বেল হইয়া উঠিল।

কল্পলতা-সম্পাদক গৃহের এককোণে বসিয়া বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত ধূমপান করিতেছিলেন। এত উৎসাহ এত উত্তেজনার মধ্যেও তাঁহার কিছুমাত্র বিকারভাব, বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখিলাম না।

"আপনি এত দেরী করে এলেন, মন্মথ বাবু? আসুন, আমাদের কবিবর ও ঐতিহাসিক চূড়ামণির সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেই।"

মন্মথ বাবু ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীদিগের সহিত পরিচিত হইবার জন্য নিশ্চয়ই তাঁহার একটা আগ্রহ হইয়া থাকিবে। না হইলেও আমার কর্ত্তব্য কার্য্য ত বটে।

"ইঁহাদের সঙ্গে বোধ হয় আপনাদের পরিচয় নাই। আমার বন্ধু মন্মথ—"

অসমাপ্ত কথার উত্তরে উভয়ে সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কে ও, অনাদি বাবু! আপনি কোথা থেকে? যতীনবাবু, আপনাকে কষ্ট পাইতে হইবে না, আমরা উঁহাকে বিলক্ষণ চিনি।"

"আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, "অনাদিবাবু! কোন্ অনাদি বাবু?"

ঐতিহাসিক হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বুঝি উঁহাকে মন্মথ বাবু বলিয়াই জানিতেন? ছদ্মবেশটা উঁহার বেশ অভ্যস্ত আছে।"

আমি ভাবিতেছিলাম, অনাদিচরণ! এই নিরীহ-প্রকৃতি ব্যক্তির শান্ত নয়ন যুগলের মধ্যে কল্পনা ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিক্ষমতা যে বাসা করিয়া বসিয়া আছে, আগে জানিলে কি কখনও আমি অতখানি বাড়াবাড়ি করিতাম।

কবি বলিলেন, "যতীন বাবু, দেখিতেছি তা হলে উঁহার সমুদায় পরিচয়টা এখনও জানেন না! উনি শ্রদ্ধাস্পদ 'কল্প-লতা' সম্পাদক।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। এ কি প্রহেলিকা! আমার সর্ব্বাঙ্গে দরদর ধারায় স্বেদ ঝরিতে লাগিল, কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া ঘরের কোণের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তবে উনি কে?"

"বীরেন বাবু? উনি ত কার্য্যাধ্যক্ষ। অনাদি বাবু, এখন হইতে কাগজের পৃষ্ঠে আপনার প্রকৃত নামটি প্রকাশ করিবেন। অনেকে দেখিতেছি সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষে বিষম ভুল করিয়া বসেন।"

নিতান্ত দীননেত্রে আমি মন্মথ বাবুর প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিলাম।

তিনি আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বলিলেন, "চলুন, ও সব বাজে কথা শুনিবেন না। এখন একটু ধূমপানের চেষ্টা দেখা যাক্।"

প্রতিষ্ঠা।

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শয়ন-মন্দিরের দ্বার সশব্দে উদ্ঘাটিত করিয়া আরক্তনেত্রে সুরেন্দ্র বাবু বাহিরে আসিলেন। তীব্রকণ্ঠে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন "আমার ছেলেকে মারিয়াছ কেন? তুমি মারিবার কে?"

দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া, হরেন্দ্র তখন সবে বাসায় ফিরিয়াছে, সুতরাং দাদার অকারণ তীব্র ভৎসনা নীরবে হজম করিবার শক্তি সে সময় তাহার ছিল না। সে বলিয়া ফেলিল, "আপনি যখন বলিতেছেন, তখন সত্যই আমি কেহ নহি, আমার কোনও অধিকার নাই; কিন্তু আপনার অতটুকু ছেলে, আমাদের আশ্রিত পিতৃ-মাতৃহীন অত বড় ভাগিনেয়কে অকারণ চোর বলিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল, কই সে জন্য ত আপনার পুত্রকে শাসন করিলেন না?"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। একটা দুরন্ত রাক্ষস-প্রকৃতি তাঁহার বুকের ভিতরটা নাড়া দিয়া চোখ মুখ দিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিল। তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কি, যত বড় মুখ, তত বড় কথা! আমার খেয়ে

আবার আমার মুখের উপর জবাব! বেশ করিয়াছে, আমার ছেলে কাহারও অন্ন-দাস নহে।"

হরেন্দ্রের ব্রহ্মতালুতে ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল, রক্ত-স্রোতঃ তাহার শিরায় শিরায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আপনি ছেলের পক্ষ লইয়া ভায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিতে চাহেন? আমিও কাহারও প্রসাদের কাঙ্গাল নই। আপনার অন্যায় সহ্য করিব কেন?"

দ্বারদেশে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া সুরেন্দ্র নাথ বলিলেন, "যাও, এখনই আমার বাড়ী হইতে দূর হও।"

দীপকে ঝঙ্কার দিয়া বধূঠাকুরাণী বলিলেন, "ও বাবা! এত তেজ? তবু যদি বাপের ভাত খেয়ে হ'ত। আমার বাবা ভাগ্যিস্ দয়া ক'রে টাকা দিয়েছিলেন, তাই এখন ব্যবসা করে পেটের ভাত জুটছে। পরের খেয়ে যে মানুষ, তার এত তেজ, এত দম্ভ কেন গা বাপু? সহ্য না হয়, সোজা পথ আছে, চলে যাও।"

"ক্ষমা করুন, দোহাই আপনার বৌ ঠাকৃরুণ। আপনার বাক্যযন্ত্রণা অসহ্য। আমি এখনই যাইতেছি।"

হরেন্দ্র দ্রুতপদে স্বীয় শয়ন-কক্ষের অভিমুখে গমন করিল।

"ও ঘরে যেওনা, ও সব জিনিসে তোমার হাত দিবার কোনও অধিকার নাই। সব আমার বাপের বাড়ীর।"

ঘৃণায়, অপমানে হরেন্দ্রের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, "কেন আমার কি কিছুই নাই?"

হরেন্দ্রের ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, "তোমার বাবা ত কিছু রেখে যান নি যে থাকবে? সব আমার নিজের। এমন পোড়া বাপও দেখিনি বাপু, পেটের জন্য সর্ব্বস্ব নষ্ট করে গেছে।"

উত্তেজিতস্বরে হরেন্দ্র বলিল, "আমায় যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, কিন্তু সাবধান, বাবার পবিত্র নাম অমন করিয়া উচ্চারণ করিবেন না, আপনি স্ত্রীলোক—"

মুষ্টি উদ্যত করিয়া দাদা এক লম্ফে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "বেশ করিবে, লক্ষবার বলিবে। তোর কি, পাজী, বদমাস! আমার স্ত্রীকে অপমান! বেরো—দূর হয়ে যা।"

হায়! এই কি তাহার চিরজীবনের আদর্শ—সহোদর! অলক্ষ্যে হরেন্দ্রের হস্তও মুষ্টিবদ্ধ হইল।

ভ্রাতৃজায়া সভয়ে ডাকিলেন, "দরোয়ান!"

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন, "শূয়ারকো আবি নিকালো।"

মুহূর্ত্তে আত্ম-সংবরণ করিয়া হরেন্দ্র বিদ্রূপহাস্যে বলিল, "থাক্, আর বীররসের প্রয়োজন নাই, আমি আপনিই যাইতেছি।"

তিন বৎসরের খোকা ডাকিল, "কাকা বাবু, কাকা বাবু!" দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া শিশু তাহার কাকা বাবুর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ছুটিয়া আসিল। অর্দ্ধপথে শিশুর

জননী পুত্রকে কোলে টানিয়া লইলেন। শিশু ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হরেন্দ্র দ্রুতপদে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখনও তাহার কর্ণে ভ্রাতৃজায়ার শাসনবাণী ও শিশুর পৃষ্ঠদেশে তাঁহার কঠিন পাণির নিদারুণ তাড়নার শব্দ ধ্বনিত হইতেছিল।

দ্বাদশ বর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল, "ও রে, চলে গেছে, গেট বন্ধ করে দে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্যার ন্যায় নয়নপথে অশ্রুর স্রোত প্রবাহিত হইতে চাহিল। অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া হরেন্দ্র উদাস নেত্রে শূন্যহৃদয়ে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল। সংসারের পথে সকলেই চলিয়াছে। তাহাকেও এই বক্র, বন্ধুর. সীমাহীন পথ অতিবাহিত করিতে হইবে। বিশ্বের এই চিরন্তন শাসননীতি এড়াইবার উপায় নাই। কিন্তু সে কোথায় যাইবে? এই বিপুল সংসারের মাঝে মাথা রাখিবার স্থান ত তাহার নাই!

দীপ্ত মধ্যাহ্নের খর রৌদ্র হরেন্দ্রের আবরণহীন মস্তকের উপর জ্বলিতেছিল। তদপেক্ষা রুদ্রতেজে তাহার উদর দগ্ধ হইতেছিল। হায়! সংসারে কে এই অভুক্ত, নিরাশ্রয়ের

প্রতি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে? যাহার কিছু আছে, তাহার সেবার জন্য সংসার সকল প্রকার আয়োজন করিয়া রাখে। অনাথের জন্য কেহ নাই, কিছু নাই! সে পথের ধূলির মত চরণতলে চিরদিন পিষ্ট হইতে থাকে।

দুঃখের সময় পরলোকগতা জননীর স্নেহফুল্ল প্রসন্ন মূর্ত্তি, মমতাস্নিগ্ধ সহস্রবাণী তাহার মনে পড়িতে লাগিল। যে দিন আহারে এতটুকু বিলম্ব হইত, করুণারূপিণী মাতা অন্নের থালা সাজাইয়া পাখা হস্তে আসনের সম্মুখে বসিয়া থাকিতেন। আজ ক্ষুৎপিপাসাতুর গৃহহীন অভাগার পানে চাহিবার কেহ নাই। তাহার মাতা বলিয়াছিলেন, "বাবা! অন্যস্থানে কাজ কর্ম্মের যোগাড় কর। তোমার দাদা আর সে দাদা নাই!" কিন্তু সে তখন জননীর অনুরোধ, আদেশ উপেক্ষা করিয়া দাদার ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তাহার যৌবন, শক্তি ও উত্তম নিয়োজিত করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, ব্যবসায় উন্নতি হইলে তীর্থবাসিনী জননীকে পুনরায় সংসারে ফিরাইয়া আনিবে, অতীতের সহস্র অশান্তির অপ্রীতিকর স্মৃতি মনের মধ্য হইতে দূর করিয়া দিবে। হায় মানব! বিধাতার অলঙ্ঘনীয় শাসন-নীতির উপর তোমার দুর্ব্বল শক্তিপ্রয়োগের অভিলাষ বাতুলতা নহে কি? সংসারের শ্রী ত ফিরিয়াছিল, অর্থের স্বচ্ছলতা হইয়াছিল, কিন্তু মাতাকে তাঁহার ত্যক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বেই তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

"কোথায় যাইতেছ হরেন ?"

চির পরিচিত কণ্ঠস্বরে হরেন্দ্র ফিরিয়া চাহিল। তাহার প্রিয় বন্ধু সতীশচন্দ্র শামলা মাথায় কোর্টে যাইতেছিলেন।

"তোমার কি এখনও স্নানাহার হয় নাই ?"

মেঘস্তম্ভিত আকাশ বায়ুর স্পন্দনমাত্রেই প্রবল ধারায় ধরণী ভাসাইয়া দেয়। বন্ধুর সস্নেহ প্রশ্নে বহু চেষ্টাতেও হরেন্দ্রের চক্ষে অশ্রুধারা বাধা মানিল না। সে মুখ ফিরাইয়া লইল। বন্ধুর হাত ধরিয়া সতীশচন্দ্র তাঁহার গৃহে ফিরিলেন।

বিশ্রামান্তে সকল ঘটনা শুনিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, "রেঙ্গুনে যাবে ? আমার বিশেষ পরিচিত একটী সাহেব রেঙ্গুনে চাউলের কারবার করিতেছেন। তাঁহার একজন বিশ্বস্ত বাঙ্গালী সহকারীর প্রয়োজন। যাবে ?"

রেঙ্গুন ! অর্থের জন্য এখন ল্যাপল্যাণ্ডে, এমন কি পৃথিবীর শেষ সীমায় যাইতে সে প্রস্তুত। সে টাকাকে আয়ত্ত করিতে চায়। যে অর্থের গৌরবে মানুষ মানুষকে অবহেলায় চরণে দলিত করিয়া চলিয়া যায়, সে সেই চক্রাকার রজতখণ্ড সমূহের সম্রাট্ হইতে চায় !

হরেন্দ্র বলিল, "তুমি ত জান, কাজের মধ্যে দাদার ব্যবসার কার্য্যটাই জানি, আর এতকাল কেবল কাব্যের আলোচনাই করিয়াছি। কিন্তু কাব্যবৃক্ষের ফল যতই সুধাসিক্ত হউক না কেন, তাহাতে উদরের জ্বালা জুড়াইবার কোনও সম্ভাবনা

নাই। আমি রেঙ্গুনে যাইতে এখনই প্রস্তুত। এ দেশে আর আসিব না, আমি চাকরী করিব।”

সতীশচন্দ্র বলিলেন, “তবে বিলম্বে কাজ নাই। তুমি আজেই রেঙ্গুনে যাইবার উদ্যোগ কর। আমি সাহেবকে টেলিগ্রাম করিয়া দিতেছি।”

বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বন্ধু হরেন্দ্রের হস্তে দুইশত টাকার নোট দিয়া বলিলেন, “কিছু মনে করিও না ভাই! তোমার এখন অনেক টাকার দরকার। যখন সুবিধা হইবে, শোধ করিও।”

সতীশচন্দ্রের উদারতায় হরেন্দ্রের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে বাক্য বহির্গত হইল না। বন্ধু ত তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর নহে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হরেন্দ্র কর্ম্মসমুদ্রের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন করিয়াছিল। দিবানিশি তাহার হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিতেছিল; স্মৃতির অঙ্কুশতাড়না,—তীব্র যন্ত্রণার জ্বালা বিস্মৃত হইবার জন্য সে কর্ম্মের কোলাহলে ডুবিয়া থাকিবার চেষ্টা করিত। প্রভাতে মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, সে কেবল কাজের সন্ধানে ফিরিত। আর কোনও চিন্তা নাই, আর কোনও বাসনা নাই। অল্পদিনের

মধ্যে তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া হরেন্দ্র নিজেই চমকিয়া উঠিত। কিন্তু অর্থ চাই, টাকার রাজা হওয়া চাই।

এস হে চক্রাকার টাকা! তুমি মুষ্টিমধ্যে আবির্ভূত হও। তোমার বিশ্ববিমোহন রূপে একবার ভাল করিয়া দেখা দাও, গৃহ উজ্জ্বল করিয়া তোল। তোমার ঐন্দ্রজালিকস্পর্শে মায়ালোকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, তোমার বিচিত্র নিক্কণে গৃহ ধ্বনিত হউক। হে অখণ্ডমণ্ডলাকার! লৌহ-সিন্ধুকের গর্ভে ব্যাপ্ত হও, শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া ফেল।

দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, হরেন্দ্র এইরূপে অর্থের ধ্যানে কাটাইয়া দিল।

শাস্ত্রে বলে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। একাগ্রমনে ধ্যান করিলে ভগবান্ ভক্তের মানসমন্দিরে আবির্ভূত হন। হরেন্দ্রের একাগ্র কামনা, সকল সাধনার ধন ক্রমশঃ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া তাহার লৌহ সিন্ধুকে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

হরেন্দ্র সাহেবের সুনজরে পড়িয়াছিল।

প্রসন্নসলিলা ইরাবতীর পূর্ব্বপারে, নদীর উপরেই তাহার বাঙ্গলো। সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে সে নির্জ্জন কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিত। কাহারও সহিত মিশিত না। টাকাকড়ির হিসাব ও কাজ কর্ম্মের কথা ছাড়া অন্য কোনও প্রসঙ্গের আলোচনা কাহারও সহিত করিত না। আপনাকে সে মনুষ্যসমাজ হইতে সর্ব্বদা বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিত। মনুষ্যজাতির প্রতি তাহার একটা তীব্র বিদ্বেষ

জন্মিয়াছিল। প্রবাসী বাঙ্গালীরা এজন্ত তাহাকে অর্থপিশাচ, অহঙ্কারী, ভণ্ড ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিত। তাহাদের এইরূপ সমালোচনায় হরেন্দ্র গৃহ-কোণের অন্ধকারকে আরও গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিত।

কিন্তু চিরপ্রসারিত আকাশের বক্ষে সন্ধ্যার বিচিত্র চিত্র, শ্যামা মেদিনীর হৃদয়োত্থিত অপূর্ব্ব রাগিণী, তটপ্লাবিনী ইরাবতীর উদ্দাম উচ্ছ্বাস তাহার কঠোর শুষ্ক হৃদয়কে এক একবার পূর্ব্বপরিচিত স্বরে, নবীনছন্দে জাগাইয়া তুলিত। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কুটীর-অঙ্গনে উপবিষ্টা মগবালিকার কোমল-কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত, নদীবক্ষোবিহারী মগধীবরের তানলয়হীন হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যাকুলভাবে তাহার পাষাণহৃদয়দ্বারে আসিয়া আঘাত করিত। দুঃস্বপ্নের মোহজাল ছিন্ন করিয়া তাহার প্রাণটাও যেন এক একবার বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহিত। কিন্তু প্রভাতের আলোকস্পর্শে জাগরিত পাখীর প্রথম গানে নিদ্রোত্থিত জগৎ বদ্ধপরিকর হইয়া আবার যখন কর্ম্মের সন্ধানে ফিরিত, তাহার হৃদয়ও তখন অর্থোপার্জ্জন ও কর্ম্মস্রোতে আবার ভাসিয়া যাইত। স্বপ্নালসা রজনীর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে হৃদয়ের তারে যে রাগিণীর ঝঙ্কার উঠিত, প্রখর দিবালোকে, কর্ম্মচক্রের ঘর্ঘর রবে তাহার ক্ষীণধ্বনি মিলাইয়া যাইত। প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি এইরূপ জাগরণে ও স্বপ্নে কাটিয়া যাইত। বসন্ত দশবার তাহার বিচিত্র হেমসাজি পুষ্পভার পূর্ণ করিয়া, হরেন্দ্রের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া মৃদুগুঞ্জনে কাণে কাণে

বলিয়া গেল, "হে প্রিয়, আমায় লহ, আমায় গ্রহণ কর। আমি চলিয়া গেলে এমন ভাবে আর আমায় পাইবে না।" কিন্তু তাহার ব্যর্থ চেষ্টার দীর্ঘশ্বাস হরেন্দ্রের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে প্রতিহত হইয়া প্রতিবারই ফিরিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হরেন্দ্র অর্থকে বাঁধিয়াছিল সত্য; কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি কোথায়? প্রথম জীবনে যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া সে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছিল, যৌবনের প্রথম উন্মেষে, কল্পনার স্বপ্নালোকে, হৃদয়ের মণিমন্দিরে যে আদর্শমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, আজ সে কোথায়? দেউল ভগ্ন, মূর্ত্তি অন্তর্হিত? অবশিষ্ট জীবনটুকু কি অর্থের চরণে দাসখত লিখিয়া দিয়াই সমাপ্ত করিতে হইবে?

বিনিদ্রনয়নে শয্যার উপর বসিয়া হরেন্দ্র যুক্তকণ্ঠে ডাকিল, "জননী! তোমার পুত্রকে আবার কোলে টানিয়া লও। যে পথে চলিতে চলিতে পথভ্রান্ত হইয়াছি, তোমার শুভ অঙ্গুলিসঙ্কেতে সেই পুণ্যময় শোভন পথে তোমার সন্তানকে আবার ফিরিয়া যাইতে আদেশ কর। তোমার স্বর্ণবীণার উদ্দীপনাময় বিচিত্র ঝঙ্কারে বিশুষ্কপ্রায় হৃদয়কুঞ্জ আবার চিরপরিচিত সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠুক। জননী!

তোমার করুণ স্নিগ্ধদৃষ্টির উজ্জ্বল আলোকে লক্ষ্যভ্রষ্ট পথে আবার চলিতে আরম্ভ করি।"

তখন উষার অমলদীপ্তি প্রাচীর ললাটে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।

হরেন্দ্র সংকল্প দৃঢ় করিয়া সাহেবকে জানাইল, "আমায় বিদায় দিন, দেশে যাইব।"

সাহেব বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কবে আসিবে?"

"আর আসিব না সাহেব, একেবারে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

সাহেব বিষণ্ণ হইলেন, বলিলেন, "কেন যাইতেছ বাবু? আমি তোমার মাহিনা বাড়াইয়া দিব, তুমি যাইওনা।"

আবার অর্থের প্রলোভন!

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "টাকার জন্য আমি যাইতেছি না। আমার জীবনের যথেষ্ট কার্য্য এখনও বাকি আছে। এতকাল আপনার ও অর্থের সেবা করিয়াছি, এখন একবার জননীর সেবা করিবার চেষ্টা করিব।"

সাহেব হয়ত তাহার কথাটা ঠিক বুঝিলেন না। তিনি বলিলেন, "বাবু, তোমরা বড় সেন্টিমেন্টাল। পৃথিবীতে অর্থোপার্জ্জন ছাড়া আর কি কাজ আছে?"

হরেন্দ্র সে কথার কোনও উত্তর দিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দশ বৎসর পরে কল্যাণদায়িনী জন্মভূমির চিরশান্তিময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে হরেন্দ্রের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। কিন্তু কি পরিবর্ত্তন! যাহারা প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিয়া আইসে, পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহারা একটা তৃপ্তি, একটা শান্তি, আত্মীয় পরিজনের অযাচিত প্রীতি, প্রেম ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া প্রবাসের ক্লেশ বিস্মৃত হয়। কিন্তু হরেন্দ্রের গৃহ নাই; সুখ দুঃখের সমভাগী হয়, এমন একটি প্রাণীও ইহসংসারে নাই। তাহার আগমন প্রতীক্ষায় কাহারও প্রীতি-উৎফুল্ল নয়ন পথের পানে চাহিয়া উদ্বেগাকুল হয় না, সঞ্চিত স্নেহরাশি লইয়া শঙ্কিতহৃদয়ে কেহ প্রবেশদ্বারের পথে সহস্রবার যাতায়াত করে না!

তাহার পুরাতন বন্ধুগণের অনেকেই ইহলোক হইতে অকালে হিসাব মিটাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও হরেন্দ্রের বিপুল শ্মশ্রুল মুখমণ্ডল ও স্থূল কলেবর দেখিয়া প্রথমে চিনিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

কলিকাতার মধ্যে দেখিয়া শুনিয়া হরেন্দ্র প্রথমে একটি অট্টালিকা ক্রয় করিল। তাহার পর মনের মত করিয়া গৃহগুলি সাজাইয়া সে মাতৃভাষার সেবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

দশবৎসরে সে অর্থের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বুঝিয়াছিল। সুতরাং টাকাগুলি বসাইয়া না রাখিয়া একটা ব্যবসায়ে খাটাইবার সংকল্প করিল।

বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া সে একটি ছাপাখানা স্থাপন করিল।

তখন বন্ধুবর্গ তাহাকে ধরিয়া বসিলেন, এখন একটি গৃহলক্ষ্মী আনিয়া স্থায়ী গৃহী হইতে হইবে।

হরেন্দ্র বন্ধুগণকে বুঝাইল, "দিল্লীর বিচিত্র লাড্ডুটির তোমরাই সম্পূর্ণরূপে ভোগ দখল করিতে থাক। 'ও রসে বঞ্চিত' আমাকে আর দলে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিও না। আমি বেশ আছি।"

কিন্তু বন্ধুবর্গ এত সহজে রণে ভঙ্গ দিলেন না। দুই এক জন তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। তখন হরেন্দ্র স্পষ্ট বলিল, "ভাই, তোমাদের বৃথা চেষ্টা, আমি বিবাহ করিব না। যে দশবৎসর পরের শোণিতসম অর্থরাশি শোষণ করিয়া আসিয়াছে, তাহার হৃদয় এত কোমল নহে যে, কথার প্রলোভনে সহসা মুগ্ধ হইবে। বিবাহ না করিলে যদি মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই।"

হরেন্দ্রকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া বন্ধুগণ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলেন। কেহ কেহ তাহার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণও হইলেন।

হরেন্দ্র ভাবিল, অদৃষ্ট!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাব্য-সাহিত্য-আলোচনায় বিক্ষিপ্ত মনটাকে নিবিষ্ট করিবার জন্য হরেন্দ্র চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! ভাবস্রোত আর পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে হৃদয়ের কূলে উছলিয়া উঠে না কেন? যেন একটা বিরাট পাষাণতলে অবরুদ্ধ হইয়া কল্পনার খর-প্রবাহ ব্যাকুলভাবে ইতস্ততঃ পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, পাষাণে প্রতিহত হইয়া ব্যর্থমনোরথে আবার ফিরিয়া যাইতেছে।

সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর একটা তীব্র বিদ্বেষ, ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস তাহার হৃদয়ের মধ্যে দশ বৎসর ধরিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহারই অভিশাপস্বরূপ কি এই নির্ম্মম শাস্তি? তাহার প্রাণটা যেন সঙ্কীর্ণ-গণ্ডীর মধ্যে আর রুদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিল না। অভ্যাসের মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া উদার বিশ্বের পানে ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বিচিত্রবেদনাভরে হরেন্দ্র গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কাগজ, কলম টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল। সে উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে ছাপাখানার দিকে অগ্রসর হইল।

তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। চারিদিকে সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছিল। ছাপাখানার পার্শ্বের বাড়ী হইতে বাদলা-হাওয়ার সঙ্গে হারমোনিয়ম ও সঙ্গীতের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

প্রতিষ্ঠা।

হরেন্দ্র ছাপাখানার দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রিণ্টার, কম্পোজিটার সকলেই গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। হরেন্দ্র ফিরিতেছিল, কিন্তু কক্ষমধ্যে আলোক জ্বলিতেছে দেখিয়া সে ছাপাখানার মধ্যে প্রবেশ করিল। একটি দ্বাদশ কি ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক সেই উজ্জ্বল আলোকে বসিয়া তখনও নিবিষ্টমনে কাজ করিতেছিল।

হরেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইল। বালকের সুন্দর মুখমণ্ডলে আলোকরশ্মি পড়িয়াছিল। তাহার কর্ম্ম-প্রিয়তা ও একাগ্রতা দর্শনে হরেন্দ্র মুগ্ধ, আকৃষ্ট হইল। সে নিঃশব্দচরণে বালকের পশ্চাতে গমন করিল।

বহুক্ষণপরে বালক তাহার ক্লিষ্ট নয়নদ্বয় তুলিয়া পশ্চাতে চাহিল। হরেন্দ্রকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বালকের পৃষ্ঠে হাত দিয়া স্নেহবিগলিতকণ্ঠে হরেন্দ্র বলিল, "তুমি এত রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিতেছ কেন?"

অবনত মস্তকে বালক মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "ম্যানেজার বাবু বলেছেন, বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিলে এক্‌ষ্ট্রা পাওয়া যাইবে।"

হরেন্দ্র বলিল, "তুমি ছেলেমানুষ, রাত্রি জাগিয়া প্রত্যহ পরিশ্রম করিলে মারা পড়িবে। আর কখনও রাত্রি জাগিয়া কাজ করিও না।"

বালকের বিনয়নম্র ব্যবহার দর্শনে হরেন্দ্রের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল।

বালক তাহার আরক্তিম মুখমণ্ডল তুলিয়া হরেন্দ্রের পানে চাহিল। একটা তীব্র বেদনা যেন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টি ভেদ করিয়া বহির্গত হইতেছিল।

হরেন্দ্র তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আর কে আছেন?"

ছলছল নেত্রে বালক বলিল, "মা, বাবা, দাদা—সবাই আছেন, কিন্তু—"

বালকের কণ্ঠরোধ হইল। সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার মুখমণ্ডলে যে নীরব দুঃখের কাহিনী, দারিদ্র্যের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে, হরেন্দ্র যেন তাহা স্পষ্ট পাঠ করিল।

পাশের বাড়ী হইতে হারমোনিয়মের সুরের সহিত সঙ্গীত-ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
চির দিন কেন পাই না।"

হরেন্দ্র বালককে বলিল, "তুমি বাড়ী যাও। আর এখন কাজ করিতে হইবে না।"

বালক চলিয়া গেল।

হরেন্দ্র ধীরে ধীরে একখানি আসনে বসিয়া পড়িল। উন্মুক্ত বাতায়নপথে সঙ্গীতের ধ্বনি প্রবেশ করিতেছিল—

"কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে—"

হরেন্দ্র উঠিয়া দাড়াইল। আজ তাহার হৃদয়মধ্যে কি বিপ্লব বাধিয়াছে!

ম্যানেজারের বহিতে হরেন্দ্র লিখিল, বালকের মাহিনা যেন দ্বিগুণিত করা হয়। তাহার প্রেসে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কেহ যেন পরিশ্রম না করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভবানীপুরে বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রণ ছিল; হরেন্দ্র ভোজনান্তে গৃহে ফিরিতেছিল।

আকাশে ছিদ্রশূন্য মেঘ। সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধভাবে আচ্ছন্ন। হরেন্দ্র দ্রুতগতিতে ট্রামের রাস্তায় আসিয়া দাড়াইল। বাতাসটা যেন ক্রমে আর্দ্র, শীতল হইয়া আসিল। বৃষ্টির আশু সম্ভাবনা দেখিয়া সে পথিপার্শ্বস্থ একটা খোলার ঘরের 'ছাঁচের' নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ট্রাম তখনও আসিল না।

কিন্তু বৃষ্টি দেখা দিল।

হরেন্দ্র যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেই গৃহের অভ্যন্তরে কাহারা যেন গোলমাল করিতেছিল। ঝড় বৃষ্টির শব্দে স্পষ্ট কিছু শোনা যাইতেছিল না।

কণ্ঠস্বর ক্রমে উচ্চে উঠিল। একজন বলিল, "তোর জন্য আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, পথের ভিখারী হইয়াছি, তবু তুই এ কু অভ্যাস ত্যাগ করিবি না?"

আর একজন বলিল, "বেশ করিব, তোমার—"

বৃষ্টি আরও প্রবলবেগে নামিয়া আসিল। বাতাসের শব্দ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

ঝড় বৃষ্টির শব্দ অতিক্রম করিয়া ভিতর হইতে উচ্চক্রন্দনের শব্দ উত্থিত হইল, "তুই আমায় মার্‌লি ?"

সেই আর্ত্ত চীৎকারে, বেদনাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে হরেন্দ্র চমকিয়া উঠিল।

গর্জ্জন করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "ফের যদি অমন করে চীৎকার কর, তা হ'লে এখনই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব।"

সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃহৎ গুরু পদার্থের পতনশব্দ হরেন্দ্রের কাণে গেল।

তাহার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয় যেন অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। দ্রুতপদে সে বাড়ীর দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

অস্ফুট বিদ্যুদালোকে হরেন্দ্র দেখিতে পাইল, এক ব্যক্তি ভিজিতে ভিজিতে অঙ্গন অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে আসিতেছে।

তাহার পশ্চাৎ হইতে রমণীকণ্ঠে কেহ বলিল, "রাগ করে-কোথায় চল্‌লে ? উপযুক্ত ছেলে না হয় দু'কথা বলেছে, একটা চড়ই না হয় মেরেছে, তা ঘর ছেড়ে কোন্ চুলোয় যাচ্ছ ?"

ক্রুদ্ধস্বরে গৃহমধ্য হইতে প্রহারকারী বলিল, "যাক্ না, বুড়া যাবে কোথায়? তুমি শুয়ে থাক, ঠাণ্ডা লাগিও না মা! পেটের জ্বালায় এখনি ফিরে আসতে হবে।"

পথিপার্শ্বস্থ গ্যাসের উজ্জ্বল আলোক লাঞ্ছিত বৃদ্ধের মুখের উপর পড়িল। তাহার মলিন, ছিন্নপ্রায় পরিধেয় বৃষ্টিসিক্ত, কৰ্দ্দমাক্ত! শীর্ণ মুখমণ্ডল রক্তশূন্য।

হরেন্দ্রের হৃৎপিণ্ডটা যেন অজ্ঞাত বেদনাভরে সহসা আকুল হইয়া উঠিল।

"বাবা, বাবা, রাগ করে যেও না, তোমার পায়ে পড়ি বাবা, ফিরে এসো!" বলিতে বলিতে একটি বালক ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধের মস্তকে একটা ছাতি খুলিয়া ধরিল; একখানা ছিন্ন কম্বল সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া দিল। তারপর হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে বালক বলিল, "এই সে দিন জ্বর থেকে উঠেছ, বাবা! এখনি আবার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর আসবে। ফিরে এস বাবা!"

হরেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। এ যে তাহার প্রেসের সেই কম্পোজিটার বালকের কণ্ঠস্বর!

অন্ধকারের দিকে হরেন্দ্র সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্ত দেহ এরূপ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে কেন?

রোরুদ্যমান বৃদ্ধ পুত্রের হাত ধরিয়া বলিল, "না বাবা, আর আমি ফিরে যাব না। তুমি বৃষ্টিতে ভিজো না, যাও, ঘরে যাও। তোমার দাদা জানিতে পারিলে এখনি তোমায়

মারিবে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। একদিন তাহাকে নিরপরাধে তাড়াইয়া—"

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল। বিকট বজ্রনাদে সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল।

"দেবা, তুই বৃষ্টিতে বাহিরে গিয়াছিস্? এখনো এলি না? মার খাবি বল্‌ছি।"

বালক একবার পিতার মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলিয়া গেল।

হরেন্দ্র বৃদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "আমি সব শুনিয়াছি। আসুন, আজ আপনি আমার অতিথি।"

বৃদ্ধ বিহ্বলনেত্রে হরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল।

হরেন্দ্র বলিল, "কোনও সঙ্কোচ বা ভয় করিবেন না; আসুন।"

বৃদ্ধকে একরূপ টানিয়া লইয়া হরেন্দ্র ট্রামে উঠিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঝড় ও বৃষ্টি মাতামাতি করিতেছিল।

পার্শ্বের কক্ষে অতিথি নিদ্রিত। শয্যার উপর বিনিদ্র-নয়নে হরেন্দ্র আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছিল। দণ্ডের পর দণ্ড চলিয়া গেল। তথাপি তাহার নিদ্রা আসিল না। অতীতের সহস্র স্মৃতি বৃশ্চিকের ন্যায় তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। তাহার শরীর ও মনের মধ্যেও যেন একটা বিপ্লব বাধিয়াছিল। হরেন্দ্র তাহার হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিল।

বাতাস আর্ত্তচীৎকার করিয়া রুদ্ধ জানালা দরজায় আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি—পৃথিবীতে কি প্রলয়কাল উপস্থিত!

ক্রমে হরেন্দ্রের বোধ হইল, তাহার সমস্ত দেহে যেন বেদনা সঞ্চারিত হইতেছে। শয্যার উপর পড়িয়া সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। এ কি? তাহার কি হইল?

দরজা খুলিয়া হরেন্দ্র বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। আর্দ্র বাতাস শ্বসিয়া গেল, অন্ধকারপূর্ণ আকাশ মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুৎপ্রভায় উদ্ভাসিত হইল।

শীতল বাতাসে তাহার শরীর সুস্থ হইল না, বরং হাত পা যেন ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সমস্ত বিশ্বটা যেন শূন্য

বলিয়া মনে হইল। কি যেন ঘটিবে. কি যেন শেষ হইয়া আসিতেছে, যেন একখানা অন্ধকার যবনিকা তাহার চক্ষুর উপর পড়িয়া সমগ্র পৃথিবীটাকে লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।—এমনই একটা অমূর্ত্ত আশঙ্কায় হরেন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল।

সে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল! অকস্মাৎ একটা দুর্দ্দমনীয় বমনেচ্ছা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

* * * * *

অতিকষ্টে হরেন্দ্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হস্ত পদ অবশ, শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। ভৃত্যগণকে ডাকিবে এমন শক্তিও যেন নাই।

সহসা তাহার মনে হইল, এই পীড়া কি তাহার জীবন-গ্রন্থি শিথিল করিতে আসিয়াছে? একটা অব্যক্ত আতঙ্কে হরেন্দ্রের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল।

সত্যই কি ইহা মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ! হায়! সংসারের সব কাজ কি এখনই শেষ হইয়া যাইবে? এই সুন্দর পৃথিবী হইতে এত শীঘ্র কি দোকান পাট তুলিতে হইবে? হৃদয়ের মধ্যে যে মহাবাণী ধ্বনিত হইতেছে, ইহা কি সেই মহাকালের আহ্বানসূচক?

কিন্তু হায়! এখনও যে তাহার পাথেয় সঞ্চিত হয় নাই! তাহার বহু কার্য্য যে এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে!

একটা ভয়ঙ্কর নীরবতা, সীমাহীন স্তব্ধতা তাহার বুকের উপর, হৃৎপিণ্ডের উপর যেন পাষাণের মত চাপিয়া বসিল।

*　*　*　*

যখন হরেন্দ্র চক্ষু চাহিল, তখন বিদ্যুৎ আলোক কক্ষমধ্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে। ডাক্তার বাবু গম্ভীরমুখে হাত টিপিয়া নাড়ী দেখিতেছেন।

অদূরে তাহার বন্ধু ও গত রজনীর অতিথি দণ্ডায়মান।

তবে কি সে মরে নাই?

ক্ষীণস্বরে হরেন্দ্র ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন বুঝিতেছেন?"

উৎফুল্লভাব দেখাইয়া ডাক্তার বলিলেন, "ভয় নাই, সারিয়া উঠিবেন।"

কিন্তু চিকিৎসকের বাহ্য প্রফুল্লতার মধ্য হইতে প্রচ্ছন্ন সংশয় আপনি ফুটিয়া উঠিল।

হরেন্দ্র ম্লানহাস্যে বন্ধুকে বলিল, "এটার্নী বাবুকে আনতে পাঠাও ছাপাখানায় খবর দাও।"

বন্ধু অশ্রুসিক্ত নয়নে চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

অতি কষ্টে কাগজখানিতে সহি করিয়া হরেন্দ্র ক্ষীণকণ্ঠে এটর্ণি বাবুকে বলিল, "পাশের ঘরে যে ভদ্রলোকটি আছেন, কাগজ খানি তাঁহাকে দিবেন, বুঝাইয়া বলিবেন।"

এটর্নি তাহার মনের ভাব বুঝিয়া চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার সকলকে গৃহত্যাগ করিতে বলিলেন। রোগীর নিদ্রার প্রয়োজন

হৃদয়ের মধ্যে যে গুরুভার পাষাণের মত চাপিয়াছিল, তাহা যেন অনেকটা নামিয়া গেল। হরেন্দ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। হে মৃত্যু! হে অমৃত! এখন এস, এক আঘাতে হরেন্দ্রের জীবনগ্রন্থি শিথিল করিয়া দাও, তাহার আর বিশেষ আক্ষেপ নাই।

দরজা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। হরেন্দ্র ফিরিয়া চাহিল। কে তুমি বালক? ব্যাকুলকরুণ-নয়নে কেন তাহার পানে চাহিতেছ? ঐ সুন্দর মুখে কালিমা মাখা, নয়নে উদ্বেগ ও শ্রান্তির চিহ্ন! বালক, পিতার সন্ধানে আসিয়াছ? যাও, ঐ ঘরে তোমার পিতা আছেন।

বিবর্ণ মুখে বালক নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেল। হরেন্দ্রের চক্ষের নীরব ভাষা কি সে বুঝিতে পারে নাই?

আবার তীব্র বেদনা, অসহ্য যন্ত্রণায় হরেন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িল।

দরজা আবার মুক্ত হইল। গত রজনীর বৃদ্ধ অতিথি রোগীর শয্যাপ্রান্তে উন্মত্তের মত আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ হরেন্দ্রের শোণিতশূন্য শীতল হস্ত বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "আমার প্রাণের ভাই, হারানিধি তুই! আজ তোর এই দশা! পিশাচ আমি, পাষণ্ড আমি, তোকে বিনা অপরাধে তাড়াইয়া দিয়া কি যন্ত্রণা—কি শাস্তিই পাইয়াছি, কিন্তু তবু আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নাই। আমি তোর সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলাম, আজ তুই তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিয়াছিস্। তোর সর্ব্বস্ব দিয়া এখন আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবি!

"ডাক্তার! ডাক্তার! শীঘ্র এস!"

"কাকা বাবু! কাকা বাবু!"

আকুল আহ্বান হরেন্দ্রের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। দশ-বৎসর পূর্ব্বের সেই স্নেহব্যাকুল আহ্বান কি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আজ তাহাকে ধরা দিতে আসিয়াছে? সে কৃপণের মত এতদিন সেই স্নেহসম্বোধনটি বুকের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল যে!

কিন্তু পৃথিবীর আলোক আর সে চক্ষে পড়িতেছে না! কোনও স্নেহসম্বোধন কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না! কোথায় সেই স্নেহব্যাকুল নয়নদ্বয়?

হরেন্দ্র দাদার হস্ত সবলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। মৃত্যু! আসিতেছে কি?

বৃদ্ধের হাত সরাইয়া লইতে বলিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আপনারা দেখ্‌ছি রোগীকে বাঁচিতে দিবেন না। এরূপ উত্তেজনায় সহসা মৃত্যু হইতে পারে। অত ব্যস্ত হইবেন না, দেখিতেছেন না, ইঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছে?"

বিসর্জ্জন।

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শশাঙ্কশেখর যখন নবীন যৌবনের প্রখর আলোকে সমগ্র জগৎ মধুময় দেখিত, তখন সৌন্দর্য্যকে লাভ করিবার বাসনা তাহার হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু যখন মাতা বহু সন্ধানের পর তাহার জন্য একটি লক্ষ্মী-রূপিণী সুন্দরী বধূ গৃহে আনিলেন, তখন শশাঙ্কশেখর চঞ্চল হইয়া পড়িল। আশানুরূপ রূপলাবণ্যশালিনী গুণবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া প্রথমতঃ তাহার কল্পনানুগ্ধ অতৃপ্ত হৃদয় উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু পত্নীর দেহে স্বর্ণাদীপ্তি যতই উজ্জ্বল ও যৌবনশ্রী যতই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, শশাঙ্ক ততই বিব্রত ও অস্থির হইয়া পড়িল। এত সৌন্দর্য্য সে কেমন করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করিবে, সেই চিন্তায় সে দিবানিশি দগ্ধ হইতে লাগিল। কতবার নানাছলে সে অন্তঃপুরে আসিত, সতর্ক-দৃষ্টিতে, সাবধানে পত্নীর প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করিত। অন্তঃপুরে যে সকল পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল, তাহাদের গতিবিধি ও ব্যবহার সে দার্শনিকের ন্যায় অনুসন্ধিৎসুলোচনে পর্য্যবেক্ষণ করিত।

সুতরাং শশাঙ্কের হৃদয়ে তিলমাত্র শান্তি ছিল না। প্রচ্ছন্ন সন্দেহ মানুষের সকল সুখ হরণ করে। একটা ভিত্তি-হীন সন্দেহের ছায়া সর্ব্বদা তাহার অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। আহারে, বিহারে, নিদ্রায় বা স্বপ্নে, কিছুতে তাহার শান্তি ছিল না।

কোনও আত্মীয়ের গৃহেও পত্নীকে পাঠাইতে শশাঙ্কের সাহস হইত না। তাহার মনে সর্ব্বদা আশঙ্কা ছিল যে, তাহার রূপসী পত্নীটিকে লুফিয়া লইবার জন্য সমগ্র পুরুষজাতি যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছে!

এরূপ আশঙ্কার একটি কারণও ছিল। শৈলবালা একে সুন্দরী, তাহাতে বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা। পিতা মাতার একমাত্র সন্তান বলিয়া তাঁহারা সযত্নে শৈলবালাকে নানারূপ ললিতকলা শিক্ষা দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের বড় বড় কবির অনেক কাব্য তাহার কণ্ঠাগ্রে ছিল।

এই সকল কারণে হতভাগ্য শশাঙ্ক বড়ই উদ্বিগ্ন ও অসুখী ছিল। ভিনোলিয়া ও পেয়ার্সের সাবান তাহার দেহের বর্ণকে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে কিনা, প্রত্যহ শতবার দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শশাঙ্ক তাহা মনে মনে বিচার করিয়া দেখিত। তাহার ভয় ছিল, বিদুষী, রূপবতী পত্নী বুঝি তাহার এ মূর্ত্তিতে পরিতৃপ্ত নহে! মনোরঞ্জনার্থ সর্ব্বদা পত্নীর অঞ্চল ছায়ায় থাকিতে শশাঙ্ক ভালবাসিত না; কিন্তু তাহাকে নয়নের অন্তরালে রাখাও নিরাপদ নহে, এ চিন্তাও শশাঙ্কের হৃদয়

সর্ব্বদা দগ্ধ করিত। অবস্থা যখন এইরূপ সঙ্কটসঙ্কুল, সেই সময় জননী আদেশ করিলেন যে, শশাঙ্ককে পর দিবস প্রত্যুষেই জয়রামপুরের কাছারীতে যাত্রা করিতে হইবে। শশাঙ্ক পৃথিবী অন্ধকার দেখিল। কাল যে দোল পূর্ণিমা!

দুঃখে হৃদয় জর্জ্জরিত হইলেও শশাঙ্ক জননীর আদেশ উপেক্ষা করিতে সাহসী হইল না। বিদ্রোহী কথাগুলি জিহ্বাগ্রে আসিয়াই ফিরিয়া গেল। মাতা স্নেহপরায়ণা হইলেও তাঁহার সংকল্প অটল, এ কথা শশাঙ্ক বিলক্ষণ বুঝিত।

সুতরাং পর দিবস প্রত্যূষেই সন্দিগ্ধহৃদয়ে, ক্ষুণ্নমনে শশাঙ্ক গৃহ হইতে যাত্রা করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যালোকচিত্রিত গগনতল হারমোনিয়মের মিষ্ট সুর ও পূর্ণ-কণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনিতে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তরঙ্গ ঠেলিয়া শশাঙ্কশেখরের বজরা প্রস্তরমণ্ডিত সোপানশ্রেণীর পার্শ্বে আসিয়া লাগিল। গঙ্গার উপরেই তাহাদের অট্টালিকা। শশাঙ্কের কর্ণে সে গীতরব প্রবেশ করিল। সে চকিত হইয়া উঠিল। কে গান গায়?

জননীর পত্রে সে অবগত হইয়াছিল, তাহার ভগিনীপতি বিহারীবাবু বহুকাল পরে ছুটী লইয়া আরা হইতে আসিয়াছেন,

এবং সম্প্রতি শ্বশুরালয়েই অবস্থান করিতেছেন। শৈলবালা লিখিয়াছিল, বিহারীবাবুর আগমনে নিত্য উৎসব হইতেছে। গানে, গল্পে ও হাস্য-পরিহাসে তাহাদের দিন বড় সুখে কাটিয়া যাইতেছে। বিহারীবাবু অত্যন্ত আমোদপ্রিয়, বিশেষতঃ তাঁহার গলাটি ভারি মিষ্ট।

সংবাদ পাইয়াই শশাঙ্কের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু গুরুতর কার্য্যভার হস্তে থাকায় উহা সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমন তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুতরাং নিয়তির অনুশাসনে শশাঙ্কশেখরকে বাধ্য হইয়া নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত কোনরূপে জয়রামপুরে থাকিতে হইয়াছিল।

শশাঙ্ক দুইবার মাত্র তাহার ভগিনীপতিকে দেখিয়াছিল। ডেপুটীগিরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বিহারীবাবু শশাঙ্কের কনিষ্ঠা ভগিনী তরুলতার পাণিগ্রহণ করেন। তার পর সস্ত্রীক পশ্চিমে চাকরী স্থলে গমন করেন। সেই অবধি পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি আর শ্বশুরালয়ে আসেন নাই। কেবল গত বৎসর কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তিনি একাকী একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং তিন রাত্রি তাহাদের বাড়ীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন।

শশাঙ্ক সুপুরুষ মাত্রকেই ভয় করিত। বিহারীবাবু সুপুরুষ, সুগায়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সুতরাং শশাঙ্ক তাহার পত্নীর জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

বিসর্জ্জন।

তিনমাস পরে গৃহে ফিরিয়াও শশাঙ্কশেখর বিন্দুমাত্র শান্তিলাভ করিতে পারিল না। হায়! "যেখানে অস্ত্রের খেলা ব্যথাও তথায়!" পাংশুবর্ণমুখে, স্পন্দিতবক্ষে, শশাঙ্ক বজরা ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। জননীর চরণ বন্দনার পর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, তাঁহার প্রতীক্ষায় কেহ তথায় বসিয়া নাই। কেবল ছাদের উপর হইতে সঙ্গীতধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিল,—

"তোমারে সঁপেছি আমারি প্রাণ,
ওগো বিদেশিনী!"

দুই হস্তে কম্পিত বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া অপরাধীর ন্যায় সন্তর্পণে ও লঘুগতিতে শশাঙ্ক ত্রিতলের ছাদে উঠিল। দ্বার-পার্শ্ব হইতে উঁকি মারিয়া সে দেখিল, তাহার ভগিনীপতি বিহারীবাবু হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতেছেন। তাহার বিধবা জ্যেষ্ঠা-ভগিনীর পুত্র কন্যারা বিহারীবাবুকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। অদূরে তরুলতা ও তাহার জীবনসঙ্গিনী শৈলবালা বসিয়া একাগ্রমনে সঙ্গীতসুধা পান করিতেছে।

শশাঙ্কশেখর হাড়ে চটিয়া গেল। পরপুরুষের সঙ্গীতশ্রবণে তাহার পত্নীর কি অধিকার? এত আগ্রহই বা কেন?

শশাঙ্কের চরণ আর উঠিল না। সে একবার বিহারীবাবু ও পরক্ষণে আপনার দেহের প্রতি চাহিয়া দেখিল।

সিঁড়ির দরজায় একটা শব্দ শুনিয়া তরুলতা ফিরিয়া চাহিল। কি লজ্জা! দাদা যে! মস্তকে অবগুণ্ঠনের পরিসর বাড়াইয়া

দিয়া তরুলতা উঠিয়া দাঁড়াইল। বালক-বালিকারা আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিল, "মামা বাবু! ওরে মামা বাবু এসেছেন!"

বিহারীলাল হারমোনিয়ম রাখিয়া বলিলেন, "আরে কেও শশাঙ্কবাবু যে? এস এস, তুমি বাড়ী ছিলেনা, আমার ছুটীটা বৃথা কাটিয়া গেল।"

বহুকাল পরে শ্যালক ও ভগিনীপতির সম্মিলনে শ্যালক অন্তরে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। তাহার হৃদয় সংশয়ের তীব্র যন্ত্রণায় জ্বলিতেছিল। কিন্তু সংসার ও সমাজের বিধান বড় কঠোর। অন্তরের জ্বালা বাহিরে প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। সুতরাং শশাঙ্ক মুখের উপর কৃত্রিম হাসি ফুটাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল।

শৈলবালা স্বামীর আগমনে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পলায়নের উপক্রম করিল; কিন্তু বিহারীবাবু বাধা দিয়া সহাস্যে বলিলেন, "সে কি হয় বৌদি, তুমি গেলে আমাদের সমস্ত আমোদটাই মাটী হ'য়ে যাবে। এখন কাহাকেও যাইতে দিব না। আজ যুগলরূপ না দেখিয়াই ছাড়িয়া দিব?"

তরুলতা ও শৈলবালা অগত্যা অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া একধারে বসিয়া রহিল। বিহারীবাবু হারমোনিয়মে সুর দিয়া গাহিলেন,—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি অবসর মত বাসিও।"

সঙ্গীতে শশাঙ্কের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল ; কিন্তু সম্প্রতি রাগিণীর ঝঙ্কার 'বরদাস্ত' করা তাহার পক্ষে বিষম কষ্টকর হইয়া উঠিল। শরীর নিতান্ত অসুস্থ বলিয়া শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

পরিহাসের অবসর ত্যাগ করিতে না পারিয়া বিহারীবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যেতে পার ; কিন্তু তোমার গৃহিণীকে আপাততঃ ছাড়িয়া দিতে পারিতেছি না। অন্ততঃ গোটা দুই জয়দেবের পদাবলী না শুনাইয়া আমি সভাভঙ্গ করিব না।"

শশাঙ্ক অলক্ষ্যে একবার পত্নীর প্রতি তীব্র জ্বালাময় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আর দুইদিন পরে তরুলতা স্বামীর সহিত পশ্চিমে চলিয়া যাইবে, সুতরাং আজ সন্ধ্যার পর হইতেই তাস খেলার ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

অপরাহ্নে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। আর্দ্র বাতাস ফুলের গন্ধ বহিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। গঙ্গার ঘাটে বসিয়া কে বাঁশী বাজাইতেছে। আলোকিত কক্ষমধ্যে পুষ্পগন্ধময় বাতাস ও বাঁশীর করুণতান যেন কাহাকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে।

সঙ্গীর অভাবে তিনজনে গোলাম-চোর খেলিতেছিল। পুনঃ পুনঃ চোর হইয়াও বিহারীলালের উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, এবার আমি নিশ্চয়ই জিতিব।" কিন্তু তাঁহার পড়্তা আর ফিরিল না। সকলের হাতের কাগজ মিলিয়া গেল, কেবল সঙ্গিহীন রুহিতনের গোলাম বোঁরা বিহারীলালের হাতে রহিয়া গেল। তরুলতা ও শৈলবালা আনন্দে মৃদু করতালি দিয়া উঠিল।

বিহারীবাবুর অত্যন্ত স্ফুর্ত্তি বোধ হইল। খেলায় হারিয়া এমন আনন্দ তিনি অনেকদিন অনুভব করেন নাই।

ডিবার পান ফুরাইয়া গিয়াছে দেখিয়া তরুলতা বলিল, "তোমরা একটু ব'স, আমি গোটা কয়েক পান নিয়ে আসি।"

তরুলতা পান আনিতে গেল। শৈলবালা উৎসাহভরে তাস গুছাইতে লাগিল।

বিহারীলাল একটা সিগার ধরাইয়া বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। আজিকার রাত্রিটা তাঁহার বড় মিষ্ট লাগিতেছিল।

"বৌমা! একবার এদিকে এস ত?"

শ্বাশুড়ীর আহ্বান শুনিয়া শৈলবালা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিহারীবাবু সহাস্যে বলিলেন, "এখনই ফিরে এস কিন্তু; আজ বড় হারিয়েছ। রীতিমত শোধ না দিয়া আজ ছাড়া-ছাড়ি নাই।"

শৈলবালা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

উপবন-বিহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া শশাঙ্কশেখর সবে গৃহে ফিরিয়াছিল। পত্নীকে শয়নকক্ষে দেখিতে না পাইয়া সে তাহার সন্ধানে আসিতেছিল। সহসা তাহার কর্ণে বিহারী বাবুর কথার শেষভাগ ও পত্নীর সহাস্য উত্তর প্রবেশ করিল।

শশাঙ্ক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার বুকের উপর যেন একটা পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

শৈলবালা কক্ষত্যাগ করিবামাত্র শশাঙ্ক নিঃশব্দচরণে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, তাহার ভগিনীপতি একা বসিয়া আছেন, শয্যার উপর তাস ছড়ান।

শশাঙ্ক হৃদয়ে একটা দারুণ বেদনা অনুভব করিল। সে আর দাঁড়াইল না। নিঃশব্দচরণে কক্ষত্যাগ করিল। বিহারী লাল জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিলেন, তিনি শশাঙ্কের আগমন বা প্রস্থানের সংবাদ জানিতেও পারিলেন না।

সে রজনীতে হতভাগ্য শশাঙ্কের আদৌ নিদ্রা হইল না। পত্নীর ব্যবহার লক্ষ্য করিবার জন্য সে শয্যার উপর জাগিয়া পড়িয়া রহিল। কিন্তু শৈলবালা পরম নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শরতের অনাবিল আকাশ আজ সন্ধ্যার পর হইতেই মেঘভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। শয়ন গৃহের বাতায়ন সম্মুখে দাঁড়াইয়া শৈলবালা কি ম্লান গগনের নিবিড় মেঘরাশি ও স্তিমিত আলোকরেখা নিরীক্ষণ করিতেছিল? মেঘমেদুর আকাশের স্তব্ধতায় তাহার বেদনাক্লিষ্ট হৃদয় যেন আরও শোকাকুল হইয়া উঠিল।

অদূরে ফেনশুভ্র শয্যার উপর খণ্ডজ্যোৎস্নার ন্যায় এক-বৎসরের শিশু ঘুমাইতেছিল। শৈলবালা ক্লান্ত নয়নদ্বয় তুলিয়া একবার নিদ্রিত পুত্রের মুখমণ্ডলের উপর স্থাপিত করিল। ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস তাহার হৃদয় মথিত করিয়া বহির্গত হইল।

আজ পাঁচ বৎসর নারীজাতির মঙ্গল আশীর্ব্বাদরেখা সীমন্তে ধারণ করিয়া সে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। শ্বাশুড়ীর অপরিমেয় স্নেহ, ননদিনীর অগাধ ভালবাসা, সে অযাচিতভাবে, প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছে। বাড়ীর দাসদাসী, এমন কি, কুকুর বিড়ালটি পর্য্যন্ত তাহার অনুরক্ত; কিন্তু তবু তার প্রাণে সুখ নাই কেন? ধনী পিতার আদরের সন্তান বলিয়া সে আজন্ম কেবল ভালবাসায় ও স্নেহেই লালিত হইয়াছে, এখনও

ত আদর যত্নের তিলমাত্র ক্রটী নাই ; কিন্তু হায় ! তথাপি এই সপ্তদশ বর্ষ বয়সে, জীবনের আলোকপূর্ণ উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে তাহাকে কেবল, অশান্তি, অতৃপ্তি ও অবসাদের বোঝা বহিয়া বেড়াইতে হইতেছে কেন ?

স্বামীও ত তাহাকে ভালবাসেন, আদর যত্ন, করেন। কিন্তু সে ভালবাসায় কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস কোথায় ? শৈলবালার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ ত তাহাতে পুলকিত হইয়া উঠে না। তাহার হৃদয়তন্ত্রী স্বামীর ভালবাসার মোহনস্পর্শে ঝঙ্কৃত হয় না কেন ? যে কোমল, উজ্জ্বল আলোকপ্লাবনে নারীজন্ম সার্থক হয়, স্বামীর ভালবাসা কি শৈলবালার হৃদয়ে সে স্নিগ্ধ আলোক-দীপ্তি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল ?

শৈলবালা বহুবার তাহার হৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছে ; কিন্তু হায় ! সেই পবিত্র, চিরপ্রার্থিত প্রেমসঙ্গীত তাহার অন্তরের সুপ্তবীণার তন্ত্রীতে কখনও ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে নাই ! স্বামীর ব্যবহার তাহার একটা দুর্ব্বোধ প্রহেলিকার মত বোধ হইত। শৈলবালা সে প্রহেলিকা, সে ইন্দ্রজাল ভেদ করিতে পারিত না। পারিত না বলিয়াই তাহার হৃদয়ে তিলমাত্র শান্তি ছিল না।

দাসী গৃহে আলোক জালিয়া দিয়াছিল। শৈলবালা বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া শিশুপুত্রের দিকে অগ্রসর হইল। সহসা উজ্জ্বলালোকে সে দেখিল, স্বামী দ্বারপার্শ্বে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।

শশাঙ্ক চকিতবৎ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া হাস্যমুখে বলিল, "আমি এই আসিতেছি। তুমি কি ভাবিতেছিলে বলিয়া আমি তোমাকে বিরক্ত করি নাই।"

শৈলবালা স্বামীর মুখের পানে চাহিল। এ হাস্য কি কৌতুকের রূপান্তর! এ স্নেহসম্ভাষণ কি নিরর্থক, কি প্রাণহীন! হায়! এ মায়াজাল ছিন্ন করিয়া সত্যের উজ্জ্বল আলোক কখনও কি দেখা দিবে না?

স্বামীর মুখমণ্ডলে তাহার অন্তরের চিত্র শৈলবালা দেখিতে পাইল না। সেই পুরাতন রহস্য-আবরণ শশাঙ্কের দৃষ্টি ও হাস্য যেন তেমনই গাঢ়রূপে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। শৈলবালা মর্ম্মে মর্ম্মে একটা যন্ত্রণা অনুভব করিল। বহ্নি কোথায় তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না, অথচ তাহার দাহিকা-শক্তির জ্বালাময় উত্তাপে দগ্ধ হইতে হয়, এ বড় বিড়ম্বনা!

শৈল নীরবে তাহার বক্ষের উপর নিদ্রিত শিশুটির কুসুম-কোমল-স্নিগ্ধ দেহ চাপিয়া ধরিল। সংসার মরুভূমির মধ্যে এই শিশুটিই যে তাহার একমাত্র 'ওয়েসিস্'!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তিন দিনের হাসি ও বাঁশীর উদ্দীপনাপূর্ণ আনন্দস্বরে একটা করুণ ঝঙ্কার তুলিয়া জগন্মাতা বাহক-স্কন্ধে উঠিলেন।

বন্ধুবর্গের উপরোধে পড়িয়া শশাঙ্ক বিসর্জ্জন দেখিতে গিয়াছিল।

পূজার ছুটীতে এ বৎসরও বিহারীবাবু সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন। তরুলতার সাধ, ভ্রাতুষ্পুত্রটির মুখ দেখিয়া যায়।

প্রতিমা চলিয়া গেলে তরুলতা স্বামীকে বলিল, "চল না, 'ভাসান্' দেখে আসি? অনেকদিন বিসর্জ্জন দেখি নাই।"

বিহারীলালও বহুকাল বিজয়ার উৎসব দেখেন নাই, সুতরাং অত্যন্ত উৎসাহে তিনি প্রস্তুত হইলেন।

তরুলতা বলিল, "মা, তুমি যাবে না?"

জননী বলিলেন, "না বাছা, তোরা দেখে আয়। বৌমাকেও নিয়ে যাস্। বাছা আমার কোথাও যেতে পায় না।"

উৎসব দেখিতে দেখিতে সহসা শশাঙ্কের মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কোনও গতিকে বন্ধুবর্গের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সে রাত্রি আটটার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিল। জননীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াই সে তাড়াতাড়ি শয়নকক্ষে

প্রবেশ করিল। গৃহে আলোক জ্বলিতেছিল; কিন্তু বিজয়ার শুভ অর্ঘ্য লইয়া কেহত তাহাকে বন্দনা করিতে আসিল না!

বস্ত্রত্যাগ না করিয়াই সে দ্রুতপদে অন্যান্য কক্ষগুলি খুঁজিয়া আসিল। কিন্তু কোথায়? শৈলবালা, বিহারীবাবু ও তরুলতা, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া শশাঙ্কের বক্ষঃস্থল অনিশ্চিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

দাসী যখন বলিল, বৌদিদি, জামাইবাবু ও দিদিমণির সহিত বিসর্জ্জন দেখিতে গিয়াছে, তখন পৃথিবীটা যেন তাহার পদতল হইতে সরিয়া গেল। দলে পড়িয়া সে আজ দুই এক পাত্র কারণ-সুধা পান করিয়াছিল, বোধ হয়, তাহারই প্রভাবে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে নাই!

মিষ্টান্নের থালা সম্মুখে রাখিয়া দাসী বলিল, "দাদাবাবু, একটা ডাব কাটিয়া দিব?"

বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে শশাঙ্ক দাসীকে বলিল, "যা, যা, তোর আর ন্যাকাম করিতে হইবে না।"

পালঙ্কের নিম্নে জলখাবারের পাত্র, ডাব ও কাটারী রাখিয়া দিয়া দাসী চলিয়া গেল।

বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ স্তব্ধ মেঘের মত শশাঙ্ক বসিয়া রহিল। তাহার মস্তকের মধ্যে ও হৃদয়ের স্তরে স্তরে অগ্নি জ্বলিতেছিল।

প্রতিবেশীরা বিজয়ার সম্ভাষণার্থ আসিয়া শশাঙ্কশেখরের সন্ধান করিল। শশাঙ্ক কক্ষত্যাগ করিল না। মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তোর অসুখ করেছে না কি?"

এত বয়স পর্য্যন্ত শশাঙ্ক জননীর মুখের উপর জোর করিয়া একটিও কথা কহিতে সাহস করে নাই। আজ সে তীব্র স্বরে বলিল, "যাও, যাও, বিরক্ত ক'রো না। আমার কিছু হয় নি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্বাশুড়ীর প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ লইয়া শৈলবালা স্বামিসন্দর্শনে চলিল। অনেক দিন পরে আজ তাহার মুখখানি প্রফুল্ল পদ্মের মত দেখাইতেছিল। সদ্যোনিদ্রোত্থিত খোকা মাতার কোলে চড়িয়া জননীর স্নেহদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিল। গভীর স্নেহভরে শৈল পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে বুকের উপর তুলিয়া লইল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই শৈলবালা ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিল। কিন্তু শশাঙ্ক মুখ ফিরাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

শৈলবালা, মানসিক প্রফুল্লতা বশতঃ স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই। সে পুত্রকে স্বামীর কোলের উপর বসাইয়া দিয়া সহাস্যে বলিল, "আজ বিজয়া, খোকাকে আশীর্ব্বাদ কর!"

অগ্নিতে যেন ইন্ধন পড়িল। শশাঙ্কের মস্তকে কে যেন ভীম লৌহদণ্ড প্রহার করিল। সে ছিন্ন-গুণ ধনুর ন্যায় সলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পুত্রের মুখে দারুণ ঘৃণাভরে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল। তার পর সবলে শিশুকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিল, "কুলটা, বিশ্বাসঘাতিনী, ও কি আমার ছেলে যে ওর জন্মদাতা, এতক্ষণ ত তা'র কাছেই ছিলি। যা, তা'র কাছেই ওকে নিয়ে যা, সে আদর করবে।"

শশাঙ্কের নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। আরক্ত চক্ষুযুগল হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল। পত্নীর আনমিত দেহে পদাঘাত করিয়া শশাঙ্ক উল্কার ন্যায় বেগে কক্ষ ত্যাগ করিল।

তরুলতা ও বিহারীবাবু শশাঙ্কের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। পরিচারিকারাও সঙ্গে আসিয়াছিল। কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া তখনই সকলে ফিরিয়া গেল।

স্বামীর নিদারুণ বাণী শৈলবালার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা বিস্ফোরক গোলার ন্যায় তাহার পদতলে বিদীর্ণ হইয়া গেল। বহুক্ষণ এই বজ্রাগ্নিপূর্ণ কথাগুলি ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনও শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না।

এই স্বামী? এই সংসার? ইহারই নাম প্রণয়? উত্তপ্ত শোণিতস্রোত শৈলবালার মাথায় উঠিল। প্রচণ্ড আকর্ষণে তাহার হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন দীর্ণ হইয়া

গিয়াছিল। শৈলবালা হৃদয়ের মধ্যে একটা মহাশূন্য অনুভব করিল। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল?

শিশুপুত্র ভূমিতলে পড়িয়া যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল। শৈলবালার কর্ণে সে শব্দ প্রবেশ করিল; কিন্তু তাহার হৃদয়ের কোনও কোমল তন্ত্রী তাহাতে আহত হইল না। সে কেবল নির্নিমেষলোচনে শিশুর পানে চাহিয়া রহিল।

আঘাতের প্রথম অবস্থায় তাহার ক্রিয়া অনুভব করা যায় না; কিন্তু যখন প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হয়, তখন সে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে। স্বামীর নিক্ষিপ্ত প্রচণ্ড শক্তিশেল শৈলবালার হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল। যন্ত্রণা ক্রমশঃ ভীষণতর হইয়া উঠিল।

শৈলবালা অনুভব করিল, বিশ্বের সমুদয় কৌতূহলী চক্ষু যেন বিদ্রূপভরে তাহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। বাড়ীর দাস দাসীদিগের নীরব-হাস্য অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে তীক্ষ্ণমুখ শূলের ন্যায় বিদ্ধ হইতেছে। গৃহের বাতাসও যেন ক্রমশঃ তাহার নিকট লঘু হইতে লঘুতর হইয়া আসিল। শৈলবালার বোধ হইল, কেহ যেন কঠিন লৌহ-হস্তে তাহার কণ্ঠরোধ করিতে আসিতেছে!

শিশু আবার কাঁদিয়া উঠিল। স্বামীর নিক্ষিপ্ত নিষ্ঠীবন শিশুর শুভ্রললাট ও আনন কলঙ্কিত করিয়া যেন প্রদীপ্ত অঙ্গার খণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছিল। তাহার বত্রিশ নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন

করিয়া যে পবিত্র দেব-শিশু পৃথিবীর আলোক দেখিয়াছে, তাহার নিষ্কলঙ্ক ললাটে এ কি মসী-চিহ্ন!—সে জারজ?

অসহ্য যন্ত্রণাভরে শৈলবালা টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। অমনই তাহার বোধ হইল, সহস্রকণ্ঠের ব্যঙ্গ-হাস্যধ্বনি যেন তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছে, লক্ষ রসনা যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—ঐ, ঐ জারজ সন্তান।

দুই হস্তে অভাগিনী নয়নযুগল চাপিয়া ধরিল। কর্ণে অঙ্গুলি চাপিয়া শ্রবণ-পথ রুদ্ধ করিতে চাহিল; কিন্তু আজ পৃথিবীতে কি অন্য কোনও শব্দ নাই? আকাশের বজ্র,—সে ও কি নীরব?

সহসা শৈলবালার হৃদয়ে একটা রাক্ষসী-প্রকৃতি প্রচণ্ডতেজে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সংহারিণী শক্তি তাহাকে যেন মাতাল করিয়া তুলিল। এ কি অগ্নি! এ কি তীব্র যন্ত্রণা! আজ পৃথিবীতে কি নরকের অনলকুণ্ড প্রজ্বলিত হইয়াছে? শৈলবালার নয়নে কালাগ্নি ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলিয়া উঠিল।

সহসা একটা তীব্র আর্ত্তনাদ ও বিকট চীৎকারধ্বনি কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া গেল। বিপদের আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বাগ্রে তরুলতা স্বামীর সহিত শশাঙ্কের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কি সর্ব্বনাশ!—বিস্ময়ে আতঙ্কে তাহাদের বক্ষঃস্পন্দন যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল।

শোণিতপ্লাবিতদেহে মৃত্যু-যন্ত্রণা কাতর শিশু ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছে! তাহার গলদেশে ও স্কন্ধে গভীর ক্ষতচিহ্ন। শশাঙ্কের অভুক্ত মিষ্টান্ন ও ডাব শোণিতচর্চ্চিত; কক্ষতল শিশুর রক্তে প্লাবিত!

সম্মুখে অর্দ্ধবিবসনা উন্মাদিনী কর্ত্তরিকা-হস্তে দাঁড়াইয়া শিশুর পানে শূন্যনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। এই কি সেই মাতৃত্বের পূর্ণমূর্ত্তি শৈলবালা? আজ তাহার স্নেহকাতর-নয়নে সে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দৃষ্টি কোথায়? আজ এ কি সংহারিণীমূর্ত্তি!

লৌহ-অস্ত্রের অঙ্গ বহিয়া উষ্ণ রক্তধারা ভূমিতল সিক্ত করিতেছিল। বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে বিসর্জ্জনের বাদ্য তখনও থামে নাই।

সোনার ল্যাজ।

—————*—————

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতী চা পান শেষ হইলে দারোগা নটবর দত্ত আলবোলার নলটি মুখে তুলিয়া লইলেন। পূবের খোলা জানালা দিয়া আর্দ্র বাতাস ছুটিয়া আসিতেছিল। আকাশ বর্ষণক্লান্ত মেঘে আচ্ছন্ন। 'বাদলা'র' দিনে গরম চা ও তাম্রকূটধূম নটবরের হৃদয়ে বহুদিনের বিস্মৃতপ্রায় একটা সুখের চিত্র উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

তাওয়াটা সবে ধরিয়াছে, এমন সময় জেলার পুলিস সাহেবের চাপরাসী আসিয়া সংবাদ দিল, হুজুর তাঁহাকে সেলাম দিয়াছেন। বিশেষ জরুরী কাজ।

নটবর মনে মনে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন; কিন্তু মনিবের হুকুম অমান্য করিবার উপায় নাই।

চাপরাসীকে বিদায় দিয়া দারোগা বাবু ধড়া চূড়া অঙ্গে ধারণ করিলেন। একবার গড়গড়ার দিকে হতাশভাবে চাহিয়া তিনি বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, সহসা পশ্চাতের দ্বার খুলিয়া গেল। ত্রয়োদশবর্ষীয়া কুমারী কন্যা সুরমা পিতাকে অসময়ে বাহিরে যাইতে দেখিয়া বলিল, "বাবা, এত সকালে কোথায় যাচ্ছেন?"

দত্ত মহাশয় সস্নেহে বলিলেন, "যে পরের চাকর, তার আর সময় অসময় নেই মা ; সাহেব ডেকেছেন।"

এই কন্যারত্নটি ছাড়া নটবরের সংসারে অন্য কোনও বন্ধন ছিল না। তাঁহার স্নেহ, প্রেম ও ভক্তির আধারগুলি বহুদিন হইল সংসার-আবর্ত্তে পড়িয়া কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা চোর ডাকাত ঠেঙ্গাইয়া, সাধু বা অসাধু উপায়ে দোষী অথবা নির্দ্দোষকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া দারোগার হৃদয় শুষ্ক ও কঠোর হইয়া গিয়াছিল। পুলিস-সংসর্গের মহান্ ও বিচিত্র গুণ এই যে, মানুষ অতি সহজে সন্ন্যাসীর ন্যায় দয়া মায়া প্রভৃতির মোহ-বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতে পারে ; তজ্জন্য সংযম বা তপস্যার কোনও প্রয়োজন হয় না। নটবরের হৃদয় মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক ও কঠোর হইলেও কন্যার প্রতি তাঁহার অসাধারণ স্নেহ ও মমতা ছিল। বিধাতার আশীর্ব্বাদে মরু-ভূমিতেও ওয়েসিস্ পরিদৃষ্ট হয়।

পুলিস সাহেবের কুঠীতে পৌঁছিবামাত্র চাপরাসী নটবরকে সাহেবের খাসকামরায় লইয়া গেল। স্বাগতসম্ভাষণের পর সাহেব বলিলেন, "দত্ত, তোমার উপর একটা কাজের ভার দিতে চাই। তোমার কার্য্যতৎপরতায় গবর্ণমেণ্ট তোমার উপর সন্তুষ্ট, তাই এই অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজটা তোমার হাতে দিতেছি।"

নটবর গলিয়া গেলেন। স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট ! রাজার কার্য্যে তিনি জীবন দিতে পারেন। আনন্দবেগ

কিয়ৎপরিমাণে সংযত করিয়া দারোগা বিনীতভাবে বলিবেন, "হুজুরের দয়াতেই বাঁচিয়া আছি। যে কাজ করিতে বলিবেন, অধীন তখনই তাহা সম্পন্ন করিবে।"

ঈষৎ হাসিয়া হুজুর বলিলেন, "তুমি বিশ্বাসী, এবং রাজভক্ত কর্ম্মচারী বলিয়াই তোমাকে ডাকিয়াছি। এবং আমার বিশ্বাস, এ কার্য্য তোমার দ্বারাই সিদ্ধ হইবে।"

গদগদভাবে নটবর বলিলেন, "হুজুরের কোন্ আদেশ পালন করিতে হইবে, জানিতে পারি কি?"

অর্দ্ধহস্তপরিমিত তাম্রবর্ণ গুম্ফে 'চাড়া' দিয়া গম্ভীরভাবে সাহেব বলিলেন, "কাজটা গুরুতর। শুনিতেছি, বরমগঞ্জে স্বদেশীর বড় প্রাদুর্ভাব। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও কয়েক জন নিষ্কর্ম্মা যুবকের অত্যাচারে গ্রামের ব্যবসায়ীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা বৃটিশ শাসনের কলঙ্ক। সেখানে যে সবইনস্পেক্টর আছে, সে কোনও কাজের লোক নহে। তাই তোমাকে তথায় পাঠাইতেছি। এই সব অত্যাচার দমন করা চাই। কয়েক জন দুর্ব্বৃত্ত নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া গুরুতর দণ্ড দিতে পারিলেই গ্রামে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। বুঝিয়াছ, দত্ত?"

দারোগা নটবর সোৎসাহে বলিলেন "এ আর এমন কি কঠিন কাজ, হুজুর? আমি এক মাসের মধ্যেই সব ঠাণ্ডা করিয়া দিব।"

শ্বেত দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া পুলিশ সাহেব বলিলেন, "বয়কটটা যাহাতে উঠিয়া যায়, প্রাণপণে সে চেষ্টা করিতে

হইবে। যদি ভালরকম একটা ‘কেস্’ গড়িয়া তুলিতে পার, দত্ত, তাহা হইলে এবার স্পেশ্যাল ইন্‌স্পেক্টরের পদ তোমাকে দিব। কমিশনার সাহেব স্বয়ং গবর্ণমেণ্টের কাছে তোমার সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছেন। এ কাজ সন্তোষজনক রূপে সমাপ্ত করিতে পারিলে তুমি রায় বাহাদুর হইতে পারিবে।”

নটবর আজ প্রভাতে কি শুভক্ষণে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলেন! চারি দিক হইতে কেবল সুসংবাদই আসিতেছে। রায় বাহাদুর! রায় বাহাদুর খেতাব সত্যই কি তাঁহার অদৃষ্টে নৃত্য করিতেছে? এমন শুভ দিন কি আসিবে?

অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনার পর দত্ত মহাশয় ডবল সেলাম ঠুকিয়া প্রফুল্লমুখে কক্ষত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বরমগঞ্জের মসনদে উপবিষ্ট হইবামাত্র প্রবীণ দারোগা নটবর দত্তের নাম গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইল। নিজ মুখে প্রকাশ না করিলেও তিনি যে স্বদেশী-দলনে আসিয়াছেন, গ্রামের ইতর, ভদ্র, বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে কেহ বিচলিত হইল না। তাহারা পূর্ব্ববৎ

শান্তভাবে, একান্তমনে মাতৃভূমির সেবায়—দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে মন দিল।

দত্ত মহাশয় দেখিলেন গ্রামের ইতর ভদ্র, বালক, যুবা, ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই মাতৃসেবার মহামন্ত্রে দীক্ষিত। ব্যবসায়ীকে কেহ বলেন না,—'তুমি বিলাতী পণ্য আমদানী করিও না।' ক্রেতাকে অনুরোধ করিতে হয় না; সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্য কিনিয়া লয়। কেহ কাহারও উপর জোর জুলুম করে না। 'পিকেটিং' অথবা বিলাতী দ্রব্যকে 'বয়কট' করিবার বিরাট সভা সমিতিরও কোনও অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা বুঝিতে না পারিয়া বহুপূর্ব্বে বিলাতী বস্ত্র, লবণ, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের আমদানী করিয়াছিল, ক্রেতার অভাবে সেগুলি দোকানে পচিতেছে; কিন্তু মহাজনেরা সে জন্য কোনও প্রকার আক্ষেপ করিতেছে না।

দত্তমহাশয় গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে একনিষ্ঠ মাতৃপূজার এরূপ আগ্রহদর্শনে শঙ্কিত ও বিস্মিত হইলেন। কার্য্যোদ্ধারের কোনও উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। একটা কোন সূত্র না পাইলে পুলিস গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে কিরূপে? কাহাকেও বাদিরূপে খাড়া করিতে না পারিলে ত কোনও ব্যক্তিকে আসামী করা যায় না। সুতরাং পুলিসের শক্তি, নটবরের তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিল।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া গেল। দত্ত মহাশয় কোনও উপায়ের আবিষ্কার করিতে না পারিয়া গ্রামবাসীর ও পরিশেষে নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সঙ্কল্প ব্যর্থ হইলে মানুষের ক্রোধ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। নটবর সকল গ্রামবাসীর উপর হাড়ে চটিয়া গেলেন। হায়! রায়বাহাদুর-রূপ সোনার ল্যাজটির আশা কি শেষে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে?

বিশেষ অনুসন্ধানে দারোগা অবগত হইলেন, রমেশচন্দ্র বসু নামক যুবকটিকে যদি কোনরূপে মোকদ্দমায় জড়ান যায়, তাহা হইলে বরমগঞ্জের স্বদেশী আন্দোলনকে অনেকটা কায়দা করিতে পারা যায়। রমেশচন্দ্র এম, এ, পাশ করিয়া কলিকাতায় আইন পড়িতেছিলেন। সম্প্রতি পূজার বন্ধে দেশে আসিয়াছেন। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে, দেবতার মত ভক্তি করে। বাজারের ব্যবসায়ী ও দোকানদারেরা তাঁহার কথা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া চলে। ছেলের দলের তিনি নেতা। ইতর ভদ্র সকলেরই বিপদ আপদে তিনি পরম বন্ধু। রমেশ সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া গ্রামবাসীদিগের অভাব অভিযোগ জানান। মামলা মোকদ্দমা হইলে পরামর্শ দেন। এক কথায় রমেশচন্দ্র গ্রামের মেরুদণ্ড।

দারোগা এই মিতভাষী সর্ব্বজনপ্রিয় যুবকটির কার্য্যের উপর লক্ষ্য রাখিলেন।

কিন্তু যুবকটি বড় ধূর্ত্ত! এক মাসের মধ্যে শতচেষ্টা করিয়াও দত্ত তাঁহাকে কায়দা করিতে পারিলেন না। তাঁহার সমস্ত 'চাল' তিনি ব্যর্থ করিয়া দিলেন। 'পড়তা' যখন মন্দ হয়, 'দান' তখন কিছুতেই পাড়তে চায় না।

পুলিস সাহেব লিখিলেন, "দত্ত কত দূর? অক্টোবর মাসের শেষেই 'রায়বাহাদুর' টাইটেল গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিবেন।"

সে রাত্রি দারোগার সুনিদ্রা হইল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, দুই চারি দিনের মধ্যেই সৎ অসৎ, সত্য মিথ্যা, যে কোন উপায়েই হউক না কেন, স্বদেশীর শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

৩০শে আশ্বিন। বঙ্গের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে রাখীবন্ধন উৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছিল। বরমগঞ্জের পল্লীশ্রী পুণ্য প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যূষে নদীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া গ্রামের উৎসাহী যুবক ও বালকের দল মন্ত্রপূত রাখী হস্তে পল্লীতে পল্লীতে ফিরিতেছিল। তাহাদের আননে কি অপূর্ব্ব আনন্দজ্যোতিঃ, নয়নে কি স্নিগ্ধশান্তি ও আলোকদীপ্তি! 'বন্দেমাতরম্'

সঙ্গীতে আকাশ প্রান্তর ও কানন প্লাবিত হইয়া গেল। মাতার বন্দনা-গীতি সুপ্তিমগ্ন গ্রামবাসীর কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিল।

বাজার ও হাটের সমস্ত দোকানের দ্বার রুদ্ধ। ক্রয় বিক্রয় একেবারে বন্ধ; হিন্দু ও মুসলমান সকলেই এই পুণ্য দিনের স্মৃতি উপলক্ষে অরন্ধন ব্রত-পালনে দৃঢ়সংকল্প। কোনও গৃহস্থের গৃহে আজ অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে না।

নটবর দেখিলেন, আজিকার মত শুভ অবসর শীঘ্র আর আসিবে না। অভিযোগ কেহ করুক আর নাই করুক, দোষ থাক আর নাই থাক, উৎপীড়ন ও দাঙ্গা হাঙ্গামার অজুহাতে আজ এক দলকে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে। "দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই"—তাঁহারই বা থাকিবে কেন? কিন্তু প্রমাণ?—সে পরের কথা। আগে এক দলকে এখন হাজতে রাখা ত যাক্! তার পর অপরাধের একটা 'চার্জ্জ' খাড়া করা যাইবে। ভবিষ্যতে যদি মোকদ্দমা নাই টেকে? তাতেই বা এমন ক্ষতি কি? স্বদেশী দলনের উদ্দেশ্যটা ত অনেকটা সফল হইবে।

চারি জন কনষ্টেবল সহ দারোগা বাবু শিকারের সন্ধানে বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর তিনি দেখিলেন, এক দল যুবক মাতৃনামগানে পল্লীপথ মুখরিত করিতে করিতে তাঁহাদেরই অভিমুখে আসিতেছে। দলের অগ্রে স্বয়ং রমেশচন্দ্র।

নটবর অনুচরবর্গকে প্রস্তুত থাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। রমেশচন্দ্র সদলবলে তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দারোগা বাবুকে দেখিয়া তিনি সহাস্যে বলিলেন, "কি দত্ত মহাশয়, আজ রাখীবন্ধনের দিনে এত পুলিস নিয়ে কোথায় চলেছেন ?"

গম্ভীরমুখে দারোগা বলিলেন, "মাপ করিবেন, রমেশ বাবু, আজ আপনাদের বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত। তাই আমি আপনাকে দলবল সহ গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি।"

রমেশ বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কি অভিযোগ দারোগা বাবু ?"

"সে সব পরে জানিতে পারিবেন। এখন আপনারা আমার বন্দী।"

রমেশ বলিলেন, "অপরাধ কি, না জানিতে পারিলে, আমি যাইব কেন ? বিশেষতঃ, গ্রেপ্তারী পরোয়ানাখানা ত দেখান ? বেআইনী কাজ করিলে লোকে আপনার কথা শুনিতে চাহিবে না। কেহ আপনার কাছে নালিশ করিয়াছে ?"

নটবর বলিলেন, "আইন কানুনের কথা বিচারের সময় তুলিবেন। এখন আমি আপনাদের নিশ্চয়ই থানায় লইয়া যাইব। কোনও কৈফিয়ৎ এখন চাহিবেন না। আমরা পুলিসের লোক, সকলের সব কথার জবাব দিতে গেলে আমাদের চলে না। এখন গোলযোগ না করিয়া থানায় চলুন।"

রমেশ মুহূর্ত্তমাত্র কি চিন্তা করিলেন। তার পর প্রফুল্লমুখে বলিলেন, "তা আমি যাইতেছি। কিন্তু আমিও যে আপনাকে আজ বন্দী করিতে আসিয়াছিলাম। আগে আমরা আপনাকে বাঁধি।"

দারোগা চমকিয়া উঠিলেন। ব্যাকুলভাবে কনষ্টেবলগণের পানে চাহিলেন। তার পর দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তামাসা রাখুন, থানায় যাবেন কি না বলুন?"

বিনীতভাবে রমেশ বলিলেন, "আমি তামাসা করিতেছি না, সত্যই আপনার সঙ্গে থানায় যাইব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদেরও কর্ত্তব্য পালন করিতে চাই।"

রমেশ পীতবর্ণের একগাছি রেশমের রাখী বাহির করিলেন; প্রশান্তস্বরে বলিলেন, "ভারতবর্ষের স্মরণীয় দিনে এই পবিত্র রাখী আপনাকে বাঁধিতেই হইবে।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই রমেশ দারোগা বাবুর দক্ষিণ হস্তের প্রকোষ্ঠে মন্ত্রপূত রাখী বাঁধিয়া দিলেন। সমবেত যুবকগণ পূর্ণকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করিল। সেই প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গে দত্ত মহাশয়ের আপত্তির ক্ষীণ শব্দ ডুবিয়া গেল।

সঙ্গী চারি জন কনষ্টেবলের হস্তেও যুবকেরা রাখী বাঁধিয়া দিল। তাহারা কোনও আপত্তি করিল না। গ্রামের সকলকেই তাহারা চিনিত।

যুবকদিগের এই অত্যাচারে দারোগা মহাশয় বিলক্ষণ চটিয়াছিলেন! কিন্তু নিষ্ফল আক্রোশে কোনও লাভ

নাই, সুতরাং তিনি বার কয়েক গর্জ্জন করিয়াই থামিয়া গেলেন।

রমেশ বলিলেন, "এখন চলুন, দারোগা বাবু, কোথায় যাইতে হইবে বলুন। এই দলের মধ্যে কে কে আপনার মতে অপরাধী ?"

দারোগা সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এখন সকলকেই থানায় যাইতে হইবে। আমি কাহাকেও ছাড়িব না।"

যুবকগণ একবার রমেশের মুখপানে চাহিল। সে কি ইঙ্গিত করিল। তখন সকলে থানায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

বিজয়গর্ব্বে দারোগা অপরাধীদিগকে লইয়া থানায় ফিরিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অমঙ্গল-সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে গ্রামমধ্যে রাষ্ট্র হইল। যুবকদিগের অভিভাবকেরা ও গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ থানায় আসিয়া জামীনে সকলকে মুক্ত করিতে চাহিলেন। দারোগা কোনও কথায় কাণ দিলেন না। কি অপরাধে তাহারা অভিযুক্ত, তাহাও বলিতে চাহিলেন না। বহু সাধ্য

সাধনা ও প্রলোভনেও দারোগার হৃদয় বিচলিত হইল না। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "কি করিব মহাশয়, বড়ই দুঃখিত হইলাম, কিন্তু উপায় নাই। আমাকে চাকরী বজায় রাখিতে হইবে ত। সদরে এ বিষয়ে এত্তেলা দিয়াছি, এখন আমার কোন হাত নাই।"

কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। নটবর তখনও কোন ডায়েরী করেন নাই।

হতাশ হইয়া সকলে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। যুবকদিগকে হাজতে রাখিয়া দত্ত মহাশয় পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এত কষ্টের শিকার যেন হাতছাড়া না হয়।

পাচক আসিয়া বলিল, "বাবু আজ ত অরন্ধন।"

দারোগা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমার বাড়ীতে অরন্ধন? আমি কি গ্রামের লোকগুলার মত মূর্খ নাকি? আজ আরও ভাল করিয়া খাইবার যোগাড় করা চাই। একটা ইলিশ মাছ নিয়ে আয়।"

স্নানান্তে নটবর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। আজ তিনি এতক্ষণ কন্যা সুরমার সংবাদ লইতে পারেন নাই। দত্ত মহাশয় দেখিলেন, শয্যার উপর শুইয়া সুরমা রামায়ণ পড়িতেছে। পিতাকে আসিতে দেখিয়া বালিকা উঠিয়া বসিল। আজ তাহার মুখ এত মলিন কেন? সুরমার নয়নপল্লবে তখনও দুই বিন্দু অশ্রু দুলিতেছিল। দুঃখিনী সীতার বনবাসদুঃখ স্মরণ করিয়া বালিকার কোমল হৃদয় কি ব্যথিত হইয়াছিল?

পিতা সস্নেহে বলিলেন, "মা, তোমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। এখনও ভাত খাও নাই মা?"

করুণ মুখখানি নত করিয়া বালিকা বলিল, "আজ ভাত খাইব না। শরীরটা বড় অসুস্থ হয়েছে, বাবা।"

তাহার কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিয়া উঠিল। কন্যার এইরূপ ভাবান্তর পিতা বহুদিন দেখেন নাই। তিনি ব্যস্তভাবে বলি-লেন, "কি অসুখ মা? ডাক্তার ডাকিব?"

"না, বাবা, সে রকম কিছু নয়। আজ আর ভাত খাইব না। তোমার হাতে ও কি বাবা?"

সুরমার নয়নে আলোক জ্বলিয়া উঠিল।

দত্ত মহাশয় রাখীসূত্র ছিন্ন করিয়া বলিলেন, "পাজি ছেলেগুলার জ্বালায় লোকে অস্থির। আমার হাতেও রাখী বাধিতে সাহস করে? এবার জব্দ করিয়া ছাড়িয়া দিব। দিন কতক জেলের ঘানি না টানিলে বেটাদের তেজ কমিবে না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি নয়টার সময় স্থানবিশেষ হইতে বেড়াইয়া নটবর গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার বৈঠকখানা আজ নিতান্ত নির্জ্জন। গ্রামের নিষ্কর্ম্মা বৃদ্ধেরাও আজ তাস পাশা খেলিবার জন্ত তাঁহার গৃহে সমবেত হয় নাই।

ক্ষুণ্নমনে দারোগা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন! সুরমা কি এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া আছে? কন্যার শরীর তিনি অসুস্থ দেখিয়া গিয়াছেন। সমস্ত দিন সে জলস্পর্শও করে নাই। বৃদ্ধের হৃদয় কন্যাস্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, বালিকা ঘুমাইতেছে। কক্ষ-মধ্যস্থ উজ্জ্বল দীপশিখা তাহার ম্লান মুখের উপর নৃত্য করিতে-ছিল। স্বপ্নঘোরে বালিকার ওষ্ঠাধর একবার কাঁপিয়া উঠিল। পিতা স্নেহব্যাকুল দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত কন্যার নিদ্রিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলেন।

বালিকার বাম হস্ত শিথিলভাবে উপাধানে সংন্যস্ত। তাহার মণিবন্ধে ও কি? দারোগা বিস্মিত হইলেন। এ যে রাখীসূত্র! বালিকা উহা কোথায় পাইল? কে তাহার হস্তে রাখী বাঁধিয়া দিল?

নটবর দেখিলেন, একখানি রঙ্গিন ছাপান কাগজ সুরমার একপাশে পড়িয়া আছে। তুলিয়া লইয়া দত্ত মহাশয় উহা পাঠ করিলেন,—"ভাই, ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই।"

কি সর্ব্বনাশ! তাঁহার গৃহে 'স্বদেশী'!

দারোগার ইচ্ছা হইল, কন্যার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাহাকে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সুরমার শ্রান্ত মুখপানে চাহিয়া তিনি সে ইচ্ছা আপাততঃ দমন করিলেন। চিন্তাকুল-চিত্তে ধীরে ধীরে নিঃশব্দচরণে দত্ত মহাশয় বহির্বাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

আহারের তখনও কিছু বিলম্ব আছে। মাংস এখনও নামে নাই। অরন্ধন ব্রতের প্রতিশোধ-কামনায় আজ তিনি ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন; কিন্তু উৎসবটা আজ তাঁহাকে একাই সম্পন্ন করিতে হইতেছে। কারণ নিমন্ত্রিতগণ অনুপস্থিত!

নটবর শ্রান্তভাবে আরাম-কেদারায় শয়ন করিলেন। নির্জ্জনতাটা আজ এত ভীষণ ভাবে তাঁহার বুকের উপর চাপিয়া রহিয়াছে কেন? হৃদয়ের অত্যন্ত নিভৃত প্রদেশে তিনি একটা ক্ষীণ আঘাত-যন্ত্রণার মৃদু দাহ অনুভব করিলেন। দত্ত মহাশয়ের আজ কি হইল?

হাজত-গৃহের মধ্য হইতে মাতৃমন্ত্র-উপাসকদিগের উচ্চ-কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল। সমস্বরে তাহারা গাহিতেছিল—"আসিবে সে দিন আসিবে!"

নিস্তব্ধ রজনীর অন্ধকারে গাছপালা যেন এক একটা দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। বন্দনা-সঙ্গীতের প্রত্যেক চরণ গাঢ় নৈশ নীরবতা ভেদ করিয়া যেন এক একটি মূর্ত্তিমতী দেবকন্যার ন্যায় শূন্যপথে ছুটিয়া চলিল। অত্যন্ত চঞ্চল ভাবে নটবর উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার ইচ্ছা হইল, বন্দীদিগকে গান করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু পা উঠিল না। আরাম-কেদারায় তিনি সমভাবেই শুইয়া রহিলেন। থাক্, আজিকার মত যত পারে আনন্দ করিয়া লউক। কাল উহাদিগকে সদরে চালান দিতে হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সহসা একটা বিকট চীৎকারে নটবর শিহরিয়া উঠিলেন।

"আগুন! আগুন! সর্ব্বনাশ হ'ল, সব পুড়ে গেল!"

দত্ত মহাশয় একলম্ফে বাহিরে আসিলেন। তখনই রুদ্ধ-নিশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া পাচক জানাইল,—"অন্দরে আগুন লাগিয়াছে!"

নটবর আর দাঁড়াইলেন না। উঠিতে উঠিতে, পড়িতে পড়িতে তিনি অন্তঃপুরে ছুটিয়া গেলেন। কি সর্ব্বনাশ! পাকশালা ও শয়নগৃহের চাল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে!

কয়েক মুহূর্ত্ত দারোগা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শয়নকক্ষে তাঁহার জীবনের একমাত্র স্নেহাধার বালিকা সুরমা ঘুমাইতেছে! উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে দত্তমহাশয় দ্বারাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

চৌকীদার ও কনষ্টেবলেরা কলসী লইয়া চালের উপর জল ঢালিতেছিল। জল পড়িয়া পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়াছিল। তাল সামলাইতে না পারিয়া বৃদ্ধ সশব্দে মাটীর উপর পড়িয়া গেলেন। নিদারুণ আঘাতে শরীর অবসন্ন হইলেও বৃদ্ধ অতি কষ্টে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া দারোগা নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে পুনরায় ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন।

হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল! কে তাঁহার কন্যাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিবে? চৌকীদারেরা প্রাণপণে আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। বাতাস প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। উন্মত্ত দৈত্যের ন্যায় অগ্নি লোলরসনা বিস্তৃত করিয়া দিকে দিকে ধাবিত হইল।

কেহই সাহস করিয়া দারোগা বাবুর কন্যার উদ্ধার-সাধনের জন্য প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না। বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হে ভগবন্! হে অনাথনাথ!—আজ বিশবৎসরের মধ্যে নটবর ভগবানের নাম মুখে আনেন নাই!—রক্ষা কর, প্রভু! বৃদ্ধের নয়নমণি, জীবনের একমাত্র অবলম্বনকে বাঁচাও!

সহসা প্রচণ্ড অগ্নির শব্দ, চৌকিদার ও কনষ্টেবল প্রভৃতির কোলাহল মথিত করিয়া পশ্চাতে একটা ঝন্‌ঝন্ রব উত্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বিস্ময়মুগ্ধ চৌকিদারেরা দেখিল অদ্ভুকার অভিযুক্ত যুবকগণ কারাকক্ষের বাতায়ন ভগ্ন করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! রামজীবন পাঁড়ে, গোবর্দ্ধন মিছির প্রভৃতি কনষ্টেবল তাহাদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

রমেশ বলিলেন, "বাপু! থামো। আমরা পলাইতেছি না। সে ইচ্ছা থাকিলে তোমরা এই কয় জনে কি আমাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারিতে? দেখ্‌ছ না, তোমাদের সামনে

তোমাদেরই দারোগাবাবুর মেয়েটি পুড়িয়া মরিতেছে? আমরা কাজ সারিয়া আবার ধরা দিব; পলাইব না।"

দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া রমেশ সর্ব্বাগ্রে একখানি সতরঞ্চি তুলিয়া লইলেন; এক কলসী জলে ক্ষিপ্রহস্তে উহা ভিজাইয়া লইয়া তিনি তাহার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলেন; তার পর অবলীলাক্রমে প্রজ্বলিত দ্বারপথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অন্যান্য যুবকগণ তখন অগ্নিনির্ব্বাণকার্য্যে পরম উৎসাহে যোগদান করিল। তাহাদের প্রফুল্ল মুখে ঘন ঘন মাতৃনাম উচ্চারিত হইতেছিল। এক এক জনের হস্তে অসুরের ন্যায় শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহারা ঘরের চাল ও বেড়া কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। যুবকদিগের উৎসাহ ও উত্তেজনায় সমবেত সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রমেশচন্দ্র বালিকা সুরমার সংজ্ঞাশূন্য দেহ সযত্নে ও সাবধানে সিক্ত সতরঞ্চি দ্বারা আবৃত করিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দত্তমহাশয়ের অচৈতন্য দেহের পার্শ্বে তাহাকে স্থাপিত করিয়া তিনি দারোগার চৈতন্য সম্পাদনে ব্যস্ত হইলেন।

সমবেত ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে অগ্নি অল্পক্ষণমধ্যে নির্ব্বাপিত হইল। তখন বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া সেবক-সম্প্রদায় দারোগার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

নটবর তখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। রমেশ জমাদারকে ডাকিয়া বলিলেন, "রামদীন, এখন আমাদিগকে কোথায় বন্ধ করিয়া রাখিবে, চল।"

দারোগা ও তাঁহার কন্যা উভয়েই রমেশচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সুরমা ভাবিল, এই যুবকের অনুগ্রহেই আজ তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে!

রমেশের হাতের রাখীটা অগ্নিস্পর্শে ঈষৎ দগ্ধ হইয়াছিল; তিনি পুনরায় ভাল করিয়া বাঁধিতেছিলেন। সুতরাং বালিকার সজল নয়নের কৃতজ্ঞ দৃষ্টি তাঁহার চক্ষে পড়িল না।

দারোগা বলিলেন, "জমাদার, তুমি এ দিকের ব্যবস্থা কর। বাবুদের থাকিবার ব্যবস্থা আমি স্বয়ং করিতেছি।"

* * * * *

দুই দিন পরে নটবর দত্তের পালকী পুলিস সাহেবের কুঠীর সম্মুখে থামিল।

সাহেব দারোগা বাবুর মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তেমন সুন্দর আকৃতি একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে?

"দত্ত, কি মনে করে'? তোমার কাজ কতদূর অগ্রসর হইল?"

নটবর কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "হুজুর, এখন আমায় অবসর দিন। ত্রিশ বৎসর আপনাদের সেবা করিয়াছি; এ হাড়ে আর অধিক ভার সহিতেছে না। শরীর নিতান্ত

অপটু। তাই আপনার কাছে বিদায়ের দরখাস্ত দিতে আসিয়াছি।"

সাহেব অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বলিলেন, "সে কি দত্ত? গবর্ণমেণ্ট তোমাকে রায়বাহাদুর উপাধি দিতেছেন। তিন শত টাকা বেতনের উচ্চ পদও শীঘ্রই তুমি লাভ করিবে। এমন সময় কর্ম্ম হইতে অবসর লইতে চাও কেন? তোমার মত উপযুক্ত কর্ম্মচারী সহসা পাওয়া যায় না।"

নটবর নিতান্ত দীনভাবে বলিলেন, "মাপ করিবেন, হুজুর; আমার রায়বাহাদুর হইয়া কাজ নাই। গরীব মানুষ অত বড় খেতাব লইয়া কি করিব সাহেব? যে গুরুতর কাজের ভার আমার উপর দিয়াছেন, আমি তার উপযুক্ত নই। এখন আর পূর্ব্বের মত পরিশ্রম করিবার শক্তি নাই; হুজুর দয়া করিয়া আমার পেন্সনের দরখাস্তখানা মঞ্জুর করিবেন, তাহা হইলেই দাস কৃতার্থ হইবে।"

"নটবর তোমার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে রায়বাহাদুর খেতাব চাও না?"

"আজ্ঞে, হুজুর, আমি অতি গরীব। সোনার ল্যাজ আমাদের শোভা পায় না।"

কুলরক্ষা।

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রীতিমত এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ তখনও স্তম্ভিত হইয়া আছে। উদাস বাতাস এক একবার হু হু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল।

পাঠশালার ছুটী দিয়া ষষ্ঠীচরণ একাকী গৃহে বসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণটা আজ বাদলা হাওয়ার মত থাকিয়া থাকিয়া হা হা করিয়া উঠিতেছিল। প্রকৃতির করুণা যখন ধরাতলে বৃষ্টিরূপে নামিয়া আসে, তখন বর্ষার বিচিত্র মোহে নিঃসঙ্গ মানবের মন উদাস হইয়া যায়।

ষষ্ঠীচরণের স্নেহ, প্রেম বা ভক্তির কোনও আধার ছিল না। শৈশব ও কৈশোরের মাঝখানে অদৃষ্ট কখন তাঁহার সকল স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল, সে কথা ষষ্ঠীচরণের ভাল স্মরণ হইত না। সাহিত্য ও কাব্যের আলোচনায় যৌবনের নিঃসঙ্গ অবসর টুকু অতিবাহিত হইত। অবশিষ্ট সময় পাঠশালায় ছেলে পড়াইয়া কাটিয়া যাইত।

সিক্ত বৃক্ষপত্রে মেঘের কৃষ্ণছায়া গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। নির্ণিমেষ নয়নে ষষ্ঠীচরণ চাহিয়া চাহিয়া কল্পনার সুদূর স্বপ্নলোক প্রান্তে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সহসা একযোড়া খড়মের খট্ খট্ শব্দ হইল। ষষ্ঠীচরণ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, স্বয়ং বিদ্যালঙ্কার মহাশয়। সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ষষ্ঠীচরণ বৃদ্ধকে নমস্কার করিলেন। বিদ্যা-লঙ্কার স্মিত মুখে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ব'স বাপু, তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে একটি কথা আছে।"

একটিপ্ নস্য লইয়া বৃদ্ধ মৃদুস্বরে বলিলেন, "সেই বিবা-হের প্রস্তাবটা সম্বন্ধে কি স্থির করিলে?"

ষষ্ঠীচরণের প্রসন্নমুখ সহসা অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি সঙ্কোচনম্রস্বরে বলিলেন, "আমার অবস্থা আপনার অবিদিত নাই। ভাবিয়া দেখিলাম, এরূপ স্থলে দার-পরিগ্রহ মূর্খতা মাত্র।"

ত্রস্তভাবে বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, "তুমি যত দিন না তোমার অবস্থার উন্নতি করিতে পার, সে ভাবনা তোমার করিয়া কাজ নাই। মেয়ে আমার কাছেই থাকিবে। তাহার কোনও ভার তোমাকে লইতে হইবে না।"

ষষ্ঠীচরণ ম্লান মুখে বলিলেন, "কিন্তু শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিলে আপনার কুলনাশ হইবে।"

বৃদ্ধ তাচ্ছীল্যভাবে হাসিয়া ব ললেন, "কুলনাশ! আমার আবার কুলনাশ কি? সমাজ ত আমরাই। আমরা যাহা করিব, সমাজ অবনত মুখে তাহাই মানিয়া চলিবে। তাহাতে প্রতিবাদ করিবে কে?"

মৃদুস্বরে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "কিন্তু অকারণ কেন একটা গণ্ডগোল বাধাইবেন? আপনার কন্যার বিবাহের ভাবনা

কি? অনেক বড় কুলীন-সন্তান আপনার মেয়েকে বিবাহ করিতে পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাইবে। আমাকে দয়া করিয়া ক্ষমা করুন।”

বিদ্যালঙ্কার বিস্মিত হইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত ষষ্ঠীচরণের শান্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কথা কয়টি কি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ? তাঁহার নির্ব্বোধ, কুৎসিত কন্যা যে ষষ্ঠীচরণেরও অযোগ্য, ষষ্ঠীচরণ প্রকারান্তরে কি তাহারই আভাস দিল?

ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, “তবে কি তোমার এ বিবাহে মত নাই?”

বাহিরে তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। পুনরায় বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল। আকাশের দিকে চাহিয়া উদাসভাবে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, “এ বিবাহ বলিয়া নয়, বিবাহ কখনও করিব না, আমার এইরূপ সঙ্কল্প।”

এতখানি উপেক্ষা বিদ্যালঙ্কারের সহ্য হইল না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার মত এত বড় কুলীন যাচিয়া শ্রোত্রিয়ে মেয়ে দিতে চাহিতেছেন, ইহাতে ষষ্ঠীচরণ একেবারে গলিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু একি! এই সহায়সম্পদহীন হতভাগা যুবকটা এমন নিশ্চিন্তভাবে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল! এই তীব্র অপমানে তাঁহার হৃদয় যন্ত্রণায় বিচলিত হইয়া উঠিল। বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, “দেখ ষষ্ঠী, তোমার বাপ থাকিলে আজ তিনি আমার কথা এমন করিয়া ঠেলিয়া

ফেলিতে সাহস করিতেন না; কিন্তু কোন্ সাহসে আজ তুমি আমার এত অপমান করিলে?"

বিস্মিত ষষ্ঠীচরণ কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "আপনি রাগ করিতেছেন কেন? আমি আপনার কি অপমান করিলাম?"

"অপমানের বাকিটা কি রাখিলে! আমার মত এত বড় একজন কুলীনকে তুমি অনায়াসে অবহেলা করিলে। কেন? আমার মেয়ে কুৎসিত বলে? আরে মূর্খ, যদি কুরূপাই না হইবে, তবে তোর মত হীন শ্রোত্রিয়ে কেন কন্যাদান করিতে যাইব?"

ষষ্ঠীচরণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি যে কথা মনেও ভাবি নাই, আপনি কেন সে কথা বলিতেছেন? আপনার কন্যা সুন্দরী কি কুৎসিত, সে সম্বন্ধে আপনাকে কোন কথাই বাল নাই। কেন মিথ্যা আমাকে এতটা নীচ ভাবিতেছেন?"

"কি পাষণ্ড, অর্ব্বাচীন! আমি মিথ্যা বলিলাম? ম্লেচ্ছ ভাষা শিখিয়া তোর প্রকৃতি ম্লেচ্ছের মত হইয়াছে; কাহাকে কি বলিতে হয়, এখনও শিখিস্ নাই!" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে শিখাগ্রভাগ পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক তারের মত কাঁপিতেছিল। বৃদ্ধের হাতের লাঠি মাটীতে পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠীচরণের শান্ত সুন্দর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন, "জ্ঞানতঃ আমি আপনাকে কোন অপমানের কথা বলি নাই,

আপনিই যথেচ্ছ কটু বলিতেছেন। আপনি বৃদ্ধ, পিতৃতুল্য তাই নীরবে সহ্য করিলাম।”

বিকট বিদ্রূপ হাস্যে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, “বটে! কেন, তাহা না হইলে মারিতে বুঝি? বড় স্পর্দ্ধা তোর। আচ্ছা আমি যদি সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের সন্তান হই, তবে এর প্রতিফল একদিন নিশ্চয়ই পাইবি।”

কুপিত ব্রাহ্মণ খড়ম খট্ খট্ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি আবার নামিয়া আসিল। সেই বারিবিদ্যুৎব্যাকুল সন্ধ্যার অন্ধকারে ষষ্ঠীচরণ নীরবে বসিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার শান্ত ছায়ায় মাঠ ও গ্রাম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। গ্রাম্য দেবালয়ে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। স্নানের ঘাট জনশূন্য। পল্লীবধূরা জল লইয়া কখন ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। খেয়া ঘাটে শূন্য জেলে ডিঙ্গি বাঁধা। দূরে গঞ্জের নীচে হাটুরে নৌকায় আলো জ্বলিতেছে।

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে শ্যামল তৃণাসনে বসিয়া ষষ্ঠীচরণ অগাধ ভাবনা-সমুদ্রে নিমগ্ন। স্বজন-শূন্য জীবনটা কি এমনই ভাবে একদিন অজ্ঞাত অন্ধকারে মিশিয়া যাইবে? স্নেহ, প্রেম

ও ভালবাসার দাবীস্বরূপ কেহ কি কখনও তাঁহার শূন্যহৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও একটা চিহ্ন অঙ্কিত করিবে না?

পরপারের ছায়ালোক বিচিত্র বননিকুঞ্জ হইতে একটা মৃদু গন্ধ বাতাসে বহিয়া আসিল। সহসা বিদ্যালঙ্কারের ক্রোধ-দীপ্ত মুখমণ্ডল, সঙ্গে সঙ্গে শেষ কথা কয়টি ষষ্ঠীচরণের মনে পড়িল। অবিশ্বাস ও ঘৃণার হাস্যরেখা তাঁহার মুখে দীপ্ত হইয়া উঠিল। দাম্ভিকতা কি মানুষকে এতটা আত্ম-সম্ভ্রমচ্যুত করিতে পারে? বিদ্যালঙ্কার গ্রামের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জমীদার বাবুদের কুল-পুরোহিত। ইচ্ছা করিলে তিনি ষষ্ঠীচরণের যথেষ্ট অনিষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভয় কি? যাহার আপনার বলিবার ত্রিসংসারে কেহ নাই, তাহার পক্ষে সংসারের সুখ দুঃখ অতি তুচ্ছ।

নদীর জলে কলসী ডুবাইবার শব্দ হইল। স্নানের ঘাটে কেহ জল তুলিতেছিল। ষষ্ঠীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পঞ্চমীর ক্ষীণচন্দ্র আকাশের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছিল। তিনি ধীরে ধীরে পাড়ের দিকে উঠিতে লাগিলেন।

আর একজন কলসী কক্ষে ধীরে ধীরে ঘাটের পথে আসিতেছিল। সহসা ষষ্ঠীচরণের বিষাদখিন্ন মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কোমল-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কে ও? কমল?"

পরিচিত কণ্ঠের আহ্বান শুনিয়া বালিকা মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ।"

"তুমি এত রাত্রে একা ঘাটে আসিয়াছ ?"

পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে কমল বলিল, "ঠাকুরমার আজ বড় জ্বর এসেছে। এতক্ষণ তাঁর কাছে বসে ছিলুম। এখন তিনি একটু ঘুমিয়েছেন দেখে তাড়াতাড়ি জল নিতে এসেছি।"

ষষ্ঠীচরণ ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ঠাকুরমার আবার জ্বর হলো ? চল, তোমাকে বাড়ী রেখে আসি, অমনি ঠাকুরমাকে দেখে আস্‌বো।"

পথে উভয়ে আর কোন কথা কহিলেন না। কমল আনতমুখে অগ্রে চলিল। পশ্চাতে ষষ্ঠীচরণ বুকভরা ভাবনা লইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে গ্রামখানি নিস্তব্ধপ্রায়। প্রথম গ্রীষ্মের উত্তাপে পাখীরা পত্রাচ্ছন্ন নীড়ে লুকাইয়াছে। কেবল নিঃসঙ্গ ঘুঘুর করুণতান মৌনমুগ্ধ মধ্যাহ্নের নীরবতায় একটা সুর বাঁধিয়া দিতেছিল।

গ্রামের একপ্রান্তে একখানি কুটীর। ঘরের দাওয়ার উপর মাদুর বিছাইয়া কমল মহাভারত পড়িতেছিল। ঠাকুর-মা মালা করিতে করিতে নিবিষ্টচিত্তে সেই পুণ্যকথা শ্রবণ

করিতেছিলেন। একমাসের দীর্ঘ পীড়ার যন্ত্রণা তাঁহার শীর্ণ কপোলে, জীর্ণ দেহে স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

মাঠের উপর দিয়া রৌদ্রতপ্ত বাতাস শুষ্কপত্রে মর্ম্মরধ্বনি জাগাইয়া মঝে মাঝে ছুটিয়া আসিতেছিল। সেই সুনীরব আলোকময় মধ্যাহ্নে মৃদু কণ্ঠোচ্চারিত মহাভারতের কাহিনী সঙ্গীতের মত চারিদিকে একটা স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিতেছিল।

উঠানে পদ শব্দ হইল। কমল চাহিয়া দেখিল, ষষ্ঠীচরণ। কমল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

ঠাকুরমা ব্যস্তভাবে বলিলেন, "এস দাদা, বস।"

ষষ্ঠীচরণ বলিলেন. "কয়দিন আসিতে পারি নাই। আজ কেমন আছেন. ঠাকুরমা ?"

"আর দাদা, এখন মরণ হইলেই বাঁচি। মরিতে ত বসিয়াছিলাম, পোড়া যম মাঝ পথে ছেড়ে দিলে। আর কষ্ট সইতে পারি না ভাই! সবাই আমার ঘাড়ে দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সরে গেছে। সব যন্ত্রণা কেবল আমাকেই ভোগ কর্‌তে হচ্ছে। তবু কমলের যদি একটা গতি হ'তো!"

ঠাকুরমা নিশ্বাস ফেলিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। ষষ্ঠীচরণ স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "ভয় কি ঠাকুরমা, ভগবান্ মুখ তুলে চাইবেন বৈ কি। কৃষ্ণদেবপুরের সে সম্বন্ধটার কি হলো ?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "সে ভরসা গেছে। গরীব কুলীনের মেয়ে কেউ নিতে চায় না। তাতে যে রকম জ্ঞাতি শত্রু, তারা ভাংচি দিয়ে এ সম্বন্ধটাও ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।"

"এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল কেন ঠাকুরমা ?"

বৃদ্ধা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিলেন, "শত্রুরা রটাইয়াছে, মেয়েটি লেখা পড়া শিখেছে। আর তুমি আমাদের উপর দয়া ধর্ম্ম করে দেখ শোন, সদাসর্ব্বদা যাওয়া আসা কর, তাইতে তোমাদের নামে একটা মিথ্যা নিন্দা রটিয়েছে। এই সব শুনে তাদের মন ভেঙ্গে গেছে। সেই অবধি আর কোন সম্বন্ধ আস্‌ছে না।"

ষষ্ঠীচরণ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। মিথ্যা অপবাদ ! এ কথা উচ্চারণ করিবার সময় তাহাদের পাপ রসনা খসিয়া পড়ে নাই ! মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়া তাহাদের কি স্বার্থ-সিদ্ধি হইল ? তিনি এই নিরাশ্রয় দরিদ্র দুইটিকে অভাবের সময় সাহায্য করেন, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি ? কমলকে তিনি সযত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, তাহার পরিণাম এই দুরপনেয় কলঙ্ক !

রুদ্ধ কণ্ঠে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "ঠাকুর মা, আমার জন্য কমলের বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল, তার উপর আবার এত বড় কলঙ্ক ? কি করিলে এ কলঙ্ক মুছিয়া যায় ঠাকুরমা ? যদি আমি আর আপনাদের সংস্রবে না আসিলে মঙ্গল হয়, তবে আজ হইতে আর এখানে আসিব না।"

বৃদ্ধা সকাতরে বলিলেন, "যাহা হইবার তা'ত হয়ে গেছে। কলঙ্ক যা রটেছে, তা আর মুছিবার নয়। তাই বলে দাদা, তুমিও আমাদের প্রতি বিমুখ হইও না। এ গ্রামে তুমি

ছাড়া আর কেউ আমাদের মুখের পানে চায় না। অদৃষ্টে যা লেখা আছে, তা কে খণ্ডাবে বল? মা মঙ্গলচণ্ডী সব দেখ্‌ছেন, তাঁর বিচারে যা হয়, তাই ভাল। তুমি দাদা আমাদের উপর রাগ ক'রো না।"

দরজার অন্তরালে থাকিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে কমল সকল শুনিতেছিল। তাহার আয়ত চক্ষুযুগল মর্ম্মান্তিক দুঃখে, ব্যর্থ অভিমানে ও ক্ষোভে ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল।

বহুক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "এমন কোন উপায় নাই কি, যাহাতে সকল দিক রক্ষা পায়?"

ঠাকুরমা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উদাসভাবে বলিলেন, "কি আর আছে দাদা?"

ষষ্ঠীচরণ অবনতমুখে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি একটা উপায় ঠিক করিয়াছি। আপনারা কুলীন, আমি শ্রোত্রিয়। যদি অন্য কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে কমলকে আমার হাতে সমর্পণ করুন। আমার নিন্দা, আমার কলঙ্কভার আমিই বহন করিব।"

বৃদ্ধা প্রথমে কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মানুষ যে সম্বন্ধে আশার একটা কাল্পনিক দুর্গ গঠন করিয়া লয়, সেটা যদি সহসা সত্যই বাস্তবে পরিণত হইয়া যায়, তখন সেই সম্ভবটাও অসম্ভবের মত বোধ হয়। অনেক দিনের দুরাশা সত্যে পরিণত হইল দেখিয়া বৃদ্ধার আনন্দের অবধি রহিল না।

আনন্দ-উচ্ছ্বাস বৃদ্ধার মুখমণ্ডলে যখন একটু সংযত ভাব ধারণ করিল, তখন তিনি বলিলেন, "ছাই কুল মান। কাহার জন্য কুল? কমল তোমারই হইবে দাদা। কিন্তু কাজটা একটু গোপনে ও সাবধানে করিতে হইবে। জ্ঞাতি শত্রুদের মনে কি আছে জানিনা, সুতরাং কাজ শেষ না হওয়া অবধি তাদের বিশ্বাস নাই।"

ষষ্ঠীচরণ চিন্তিতভাবে বলিলেন, কি করিতে হইবে?

বৃদ্ধা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "কমলকে কিছু-দিনের জন্য দেবীপুরে পাঠাইয়া দিব। সেখানে আমার দূর সম্পর্কের এক ভাই আছেন। কয়েক দিন পরে তুমিও গোপনে সেখানে যাবে। খরচপত্র দিলে তাঁরা সব যোগাড় করে বিয়ে দিয়ে দেবেন। তা হলে আর আগে কিছু গোল হইবে না। আমি যাবো না, এইখানেই থাক্‌বো। সুতরাং জ্ঞাতিরা কোনরকম সন্দেহ কর্‌তে পারবে না, বাধাও দিতে পারবে না।"

এই পরামর্শই ঠিক হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক ষষ্ঠীচরণ যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন সংবাদটা গ্রামের মধ্যে পুরাতন হইয়া গিয়াছিল। বধূ বরণ করিবার জন্য ষষ্ঠীচরণের শূন্যগৃহে কাহারও নূপুরগুঞ্জন বা বলয়নিক্কণ শোনা গেল না। গৃহলক্ষ্মী নিজের ঘরে নিজেই প্রবেশ করিল।

এক পক্ষের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া নূতন সংসার পাতাইবার আয়োজন করিতে বেলা গড়াইয়া পড়িল। ঠাকুর মাকে যে আনিতে গিয়াছিল, সে আসিয়া বলিল "বিদ্যালঙ্কার ঠাকুর তাঁহাকে এখন ছাড়িয়া দিলেন না, কাল সকালে তিনি আসিবেন।"

ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নালোক পর্ণকুটীরের উপর তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া কখন নিভিয়া গিয়াছে।

আহারাদির পর ষষ্ঠীচরণ শয্যায় আসিয়া বসিলেন। কমল সলজ্জ-কোমল-পদক্ষেপে পানের ডিবা হাতে করিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পত্নীর বীড়ানম্র মুখ খানি বুকের উপর স্থাপিত করিয়া ষষ্ঠীচরণ কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "কমল! তুমি যে আমার সহধর্ম্মিণী এ কথা এখনও

আমার স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। এত সুখ আমার অদৃষ্টে সহিবে কি?"

সুখাবেশে কমলের কমল নয়ন-পল্লব নিমীলিত হইয়া আসিয়াছিল। চন্দ্রকরপ্লাবিত অরণ্যকুঞ্জ হইতে পাপিয়ার দূরশ্রুত হৃদয়োচ্ছ্বাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ঝিল্লীমুখরিত যামিনীর স্বপ্নালস সংস্পর্শে নিখিল বিশ্ব সুপ্তিমগ্ন হইয়া পড়িতেছিল।

"যাও কমল, বড় পরিশ্রম করিয়াছ, আহার করিয়া আইস। স্বামীর স্নেহপাশ হইতে আপনাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া কমল গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

আরাম করিয়া ষষ্ঠীচরণ শয্যায় শয়ন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় বাহিরে কেহ ডাকিল, "ঠাকুর মহাশয়! বাড়ী আছেন?"

বিরক্তস্বরে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "কে হে বাপু, এত রাত্রে ডাকাডাক কেন?"

যে ডাকিয়াছিল, সে বলিল, "একবার বাহিরে আসুন, বিশেষ দরকার আছে।"

চারি পাঁচ ব্যক্তি আলোক হস্তে বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। ষষ্ঠীচরণ নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কেও? সনাতন না কি?"

সনাতন প্রণাম করিয়া ষষ্ঠীচরণের হাতে একখানি পত্র দিল। ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "কিসের চিঠি? সনাতন উত্তর করিল, "পড়িয়া দেখুন।"

একজন একটা আলোক উঁচু করিয়া ধরিল। ষষ্ঠীচরণ নিঃশব্দে পাঠ করিলেন। সহসা তাঁহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। এ কি রহস্য! এ কি বিদ্রূপ!

সনাতন বলিল, "দাদাঠাকুর, বাবু আপনাকে চিঠিখানা দিতে বলিলেন, আর অম্‌নি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন।"

ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, দাঁড়াও আমি আসিতেছি।"

দরজা আগুলিয়া সনাতন বাধা দিয়া বলিল, "মাপ কর্‌বেন, দাদাঠাকুর; আমরা হুকুমের চাকর, হুকুম তামিল কর্‌বো বাড়ীর মধ্যে এখন যেতে পাবেন না, আমাদের উপর এমন হুকুম নাই।"

ক্রোধে, ক্ষোভে ষষ্ঠীচরণ কয়েকমুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে চল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জমীদার বাবুদের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণতল ও কক্ষগুলি মুণ্ডিতশীর্ষ ব্রাহ্মণে পরিপূর্ণ। হুঁকার শব্দ, তাম্রকূটের ধূম ও বচনজালে সভাতল কুজ্‌ঝটিকাময় শব্দপূর্ণ সাগরের মত বোধ হইতেছিল। চারিদিকে কেবল শিখাকণ্টকিত মস্তক সারি সারি বিচিত্র ভঙ্গীতে দুলিতেছে, হেলিতেছে।

সেই জনতা ভেদ করিয়া ষষ্ঠীচরণ যখন জমীদার বাবুর কাছে নীত হইলেন, তখন সংক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী যেন মন্ত্রবলে সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। চারিদিকে কেবল একটা অস্ফুট কানাকানি ও ঠারাঠারি চলিতে লাগিল।

ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে ষষ্ঠীচরণের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তিনি জমিদার বাবুকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমি আপনাদের আশ্রিত প্রজা। এই দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপর রাত্রি দ্বিপ্রহরে এ কি অত্যাচার হুজুর? আবার এই দেখুন, মহাশয়ের নাম দিয়া দুষ্টলোকে কিরূপ একটা মিথ্যা পত্র লিখিয়াছে।"

পত্রখানি দেখিয়া জমীদার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মিথ্যা নহে, এ পত্র আমারই অনুমতিক্রমে লিখিত হইয়াছে।"

বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "সে কি! কি বলিতেছেন? স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা কমলকে ত আমিই বিবাহ করিয়াছি। দেবীপুরের সর্ব্বানন্দ ঠাকুর যথাশাস্ত্র আমাদের বিবাহ দিয়েছেন।"

জমীদার কৃষ্ণশঙ্কর উচ্চহাস্যে বলিলেন, "আশ্চর্য্য করিলে! তুমি আবার তাহাকে বিবাহ করিলে কবে? কি বলেন বিদ্যালঙ্কার মহাশয়?"

বিদ্যালঙ্কার বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "অদ্ভুত গল্প বটে! লোকটা খুব ধড়িবাজ ত!"

ষষ্ঠীচরণ বিদ্যালঙ্কারের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। বৃদ্ধের নয়নে প্রতিহিংসার জ্বালাময় অগ্নি জ্বলিতেছিল! শিহরিয়া

ষষ্ঠীচরণ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "হুজুরের বিশ্বাস না হয়, কমলের ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি সব জানেন।"

বিদ্যালঙ্কারের পার্শ্বে স্বপ্নমুগ্ধার মত বৃদ্ধা বসিয়া বসিয়া কাঁপিতেছিলেন। জমীদার গম্ভীর স্বর উন্নত করিয়া বলিলেন, ঠাকরুণ, ষষ্ঠী বলিতেছে, সে কমলকে বিবাহ করিয়াছে, আপনি স্বচক্ষে সে বিবাহ দেখিয়াছেন?"

ভয়ে বৃদ্ধার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বিদ্যালঙ্কারের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইয়া আসিল। অস্ফুট স্বরে তিনি বলিলেন, "না আমি চোখে দেখিনি, তবে—"

বিদ্যালঙ্কার চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন। সেই সংক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "সকলে শুনিলেন উনি কি বলিলেন? এ বিবাহ তিনি স্বচক্ষে দেখেন নাই। বিবাহ হইলে তবে ত দেখিবেন? আরে আমরা হলেম্ জ্ঞাতি, আত্মীয়, আমরা কিছুই জান্‌লেম্ না শুন্‌লেম্ না, মেয়ের ঠাকুরমা পর্য্যন্ত জান্‌লে না, আর এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপার হয়ে গেল! এও কখন সম্ভব?"

জমীদার বাবু আবার বৃদ্ধাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি সে সময় উপস্থিতও ছিলেন না?"

তখন বৃদ্ধার পদতল হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া সরিয়া যাইতেছিল। এ কি হইল? তিনি কি বলিলেন? কি সর্ব্বনাশ করিলেন? তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন?

বিদ্যালঙ্কার ধমক্ দিয়া বলিলেন, "চুপ্ করে রইলে কেন খুড়ী? বলে ফেল, তুমি সে দিন কোথায় ছিলে? আমার কাছে ছিলে কি না?"

যে কথা গুলি বলিবেন বলিয়া বৃদ্ধা গুছাইয়া আনিয়াছিলেন, বিদ্যালঙ্কারের তীব্র ভর্ৎসনায় সব গোলমাল হইয়া গেল। তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "হাঁ বাবা, তোমার ওখানেই ছিলাম।"

তখন বিদ্যালঙ্কার স্বর আরও উচ্চে তুলিয়া বলিলেন, "এখন সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কি রকম ভয়ানক চক্রান্ত করিয়া আমাদের নির্ম্মল কুলে কালী দিবার জন্য ধূর্ত্ত ষষ্ঠীচরণ চেষ্টা করেছে। আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতি, বন্ধু কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না—এমন বিবাহ কখন হইতে পারে? আর আমি সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের সন্তান, আমি না জানিয়া শুনিয়াই কি আবার বিধি দিতে পারি? দেখ হে কৃষ্ণশঙ্কর, তোমার রাজত্বে বাস করে ব্রাহ্মণের কুল, মান, ইজ্জৎ পর্য্যন্ত রক্ষা করা দায় হয়ে উঠ্‌লো।"

তখন সেই অসংখ্য ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া বলিল, "দোহাই রাজা বাবুর, আমাদের মান, ইজ্জৎ, ধর্ম্ম রক্ষা কর। বিদ্যালঙ্কার সত্যই বলিয়াছেন। এমন ব্যবস্থা তিনি কখনই দিতে পারেন না।"

বৃদ্ধা কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু কোলাহলে সে ক্ষীণকণ্ঠ কোথায় ডুবিয়া গেল। ষষ্ঠীচরণ ক্রোধে ক্ষোভে

অধরদংশন করিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা নিষ্ঠুর রাক্ষসের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল।

একখানি বস্ত্রাবৃত ডুলি আসিয়া থামিল। শঙ্কামলিন কমলের বেপমান দেহ দুইজন দাসী প্রায় টানিয়া বাহির করিল। বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ষষ্ঠীচরণের সমুদায় ধমনীতে একটা তীব্র জ্বালাময় আগুনের স্রোত বহিয়া গেল। একলম্ফে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মুহূর্ত্তে আটদশ জন বলিষ্ঠ লোক তাঁহাকে সবলে চাপিয়া ধরিল। উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "দোহাই হুজুরের, আপনি দেশের রাজা, গরীবের মা বাপ। এমন নিদারুণ অবিচার, অধর্ম্ম করিবেন না। কমলকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, আমি অগ্নিসাক্ষী করিয়া শাস্ত্রমত উহাকে বিবাহ করিয়াছি কি না।"

দাসীদিগের বাহুবেষ্টনের মধ্যে শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ উদ্যত করিয়া উন্মুখ তরঙ্গের ন্যায় কমল স্বামীর নিকট যাইতে চাহিল।

"খবরদার!" বিদ্যালঙ্কার বাঘের মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তারপর জ্বলন্ত আগুনের মত ষষ্ঠীচরণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চুপ্ কর্ লম্পট! তোর সঙ্গে উহার বিবাহই হইতে পারে না। কেহ জানিল না, কেহ সম্প্রদান করিল না, বিবাহ!"

চারিদিক হইতে অসংখ্য কণ্ঠে শব্দ হইল, "কথনও হইতে পারে না, কখনও হয় নাই।"

জমীদার কৃষ্ণশঙ্কর বলিলেন, "পাত্র হাজীর আছে?" বিদ্যালঙ্কার এক ষষ্টি বর্ষীয় বৃদ্ধকে দেখাইয়া দিলেন।

কৃষ্ণশঙ্কর বলিলেন, "আপনি এ বিবাহে সম্মত আছেন?

বৃদ্ধ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ। কুলীনের কুলরক্ষা করাই আমাদের ব্যবসায়।"

কাঁপিতে কাঁপিতে কমল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া উঠিল।

বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, "ওরে! বাজ্না বাজা।"

চীৎকার, ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ডুবাইয়া দিয়া বাজ্না বাজিয়া উঠিল। বিদ্যালঙ্কার সম্প্রদান কর্ত্তার আসন গ্রহণ করিলেন।

ষষ্ঠীচরণের দৃষ্টি হইতে সমুদায় আলোক যেন সহসা অন্তর্হিত হইল। আকুঞ্চিত মাংসপেশী নিষ্ফল আক্রোশে স্ফীত হইয়া উঠিল। তাঁহার বুকের উপর কে যেন পর্ব্বত চাপিয়া ধরিল। তিনি যন্ত্রণারুদ্ধকণ্ঠে একবার চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বিদ্যালঙ্কার, ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করিও না; রক্ষা কর, ক্ষমা কর।"

প্রত্যুত্তরে দ্বিগুণ রবে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। হোমের আগুন আরও উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। একখানি শীর্ণ কঙ্কালসার হস্তের উপর আর একখানি স্পন্দনহীন শিথিল হস্ত রাখিয়া বিদ্যালঙ্কার ফুলের মালা ও বস্ত্রের বন্ধন দৃঢ় করিয়া দিলেন।

পূজার অর্ঘ্য।

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রৌদ্রতপ্ত, পক্ষিকূজনমুখর, দীপ্ত মধ্যাহ্নে, শ্রান্তদেহে, ধূলিধূসর-পদে গৃহে ফিরিয়া শিবদাস ডাকিল, "মোক্ষদা!"

জীর্ণ-মলিনবসনে শীর্ণ-তনুলতা কোনরূপে আবৃত করিয়া মোক্ষদা ঘরের দাওয়ার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বক্ষের উপর এক-বৎসর-বয়স্ক একটি শিশু নিদ্রা যাইতেছিল। রমণীর কেশরাশি রুক্ষ; ছিন্নবসনের ছিদ্রপথে মলিন কেশভার আত্মপ্রকাশ করিতেছিল।

স্বামীকে তখনও রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বলিল, "অমন করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিলে কি হইবে?—উপরে এস, মুখ হাত ধোও।"

শিবদাস ম্লানহাস্যে উত্তর করিল, "আমি ভাব্‌ছি, আর কত কাল এমন ভাবে চলিবে? চালে খড় নাই, পেটে অন্ন নাই, লজ্জানিবারণের বস্ত্রও নাই। তার উপর দেনার-ভরা, পাওনাদারের তাগাদা। দু'টি ছোট ছেলে, তাদের মুখেও দু' বেলা দু' মুঠা অন্ন দিবার শক্তি নাই। এমন জীবন কি দুর্ব্বহ! এমন করিয়া কয় দিন বাঁচিব? এত চেষ্টা করিলাম, একটা চাক্‌রী জুটিল না।"

পূজার অর্ঘ্য।

অনেক দুঃখ, বহু-যন্ত্রণা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইয়াছে ; বিপদের শত প্রবল ঝঞ্ঝাবাত তাহাদিগের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে ; কিন্তু তাহার স্বামীকে সে একদিনও এত বিচলিত, এত অধীর হইতে দেখে নাই। এমন কথা এক-দিনের জন্যও তাঁহার মুখে উচ্চারিত হয় নাই। আজ এ কি হইল ? মোক্ষদা নিতান্ত ব্যাকুল ও বিস্মিতভাবে শিবদাসের চিন্তাভার-ক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিল। তার পর ধীরে ধীরে স্বামীর হাত ধরিয়া দাওয়ার উপর টানিয়া আনিল।

দাওয়ার একপ্রান্তে একটি নগ্নদেহ তিন বৎসরের শিশু একটা ভাঙ্গা মাটীর পুতুল লইয়া খেলা করিতেছিল। ছিদ্রবহুল চালের মধ্য দিয়া মধ্যাহ্নের সূর্য্যরশ্মি তাহার ধূলিমলিন দেহের উপর পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল। পিতা স্নেহ-ব্যাকুল-নয়নে বহুক্ষণ পুত্রের পানে চাহিয়া রহিল। বক্ষঃপঞ্জর আন্দোলিত করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া গেল। অন্যমনস্কভাবে শিবদাস বলিল, "মোক্ষদা !—"

কথা শেষ হইল না। বাস্পভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাহার শীর্ণকপোল বহিয়া শুষ্ক মৃত্তিকার উপর পতিত হইল।

স্বামীর ব্যবহারে মোক্ষদার হৃদয় একটা অনিশ্চিত অমঙ্গলা-শঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ শূন্যপানে চাহিয়া চাহিয়া সহসা শিবদাস পত্নীর হাত চাপিয়া ধরিল ; ভগ্নস্বরে বলিল, "ব'স, একটা কথা আছে।"

"কথা পরে হবে, এখন মাথায় একটু তেল দিয়া স্নান করে এস। বেলা যে আর নাই।"

শিবদাস এবার হাসিল। বলিল, "তার পর? ঘরে ত আজ চা'ল বাড়ন্ত।"

মাটীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মোক্ষদা নিম্নস্বরে বলিল, "হরের মা চাট্টি চা'ল ধার দিয়েছে; ভাত রাঁধিয়াছি, যাও, স্নান করে এস।"

শিবদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। একটা তীব্র যন্ত্রণায় তাহার সমস্ত শরীর যেন সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। নীরবে বহুক্ষণ দাওয়ার উপর পাদচারণ করিয়া সে সহসা বলিয়া উঠিল, "না আর সহ্য হয় না। সেই ভাল, বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অপোগণ্ড শিশুদিগকে কেন মারিয়া ফেলি?"

মোক্ষদা চকিতভাবে-স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। ভীতকণ্ঠে বলিল,—"তুমি কি বল্‌ছ? আজ হয়েছে কি? তোমার পায়ে পড়ি, যাও, স্নান করে' এস।"

"ভয় নাই, মোক্ষদা আমি পাগল হই নাই। তবে এমন ভাবে চলিলে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, কে বলিতে পারে? যা বলি, মন দিয়া শোন। আমাদের যে রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা থেকে উদ্ধারের একটিমাত্র উপায় আছে। কাজটা খুবই গুরুতর, কিন্তু তা না হলে আমাদের কারও নিস্তার নাই। চির-দুর্ভিক্ষের দাবানলে সব ভস্ম হয়ে যাবে। আগেই শিশু দুটি মরিবে।"

মোক্ষদা স্বামীর পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। আজ শিবদাসের বাক্য, ব্যবহার, সকলই যেন রহস্যময়।

শিবদাস বলিল, "মুকুন্দপুরের জমীদার রামতারণ বাবুর নাম বোধ হয় শুনিয়াছ। তিনি নিঃসন্তান। অগাধ বিষয়-সম্পত্তির কেহ উত্তরাধিকারী নাই। সেই জন্য তিনি কোনও সদ্বংশজ ভদ্রঘরের একটি শিশুকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিতে চান। আমার কাছে প্রস্তাব এসেছে, বুঝেছ? গরীব না হলে ত আর কেউ ছেলে বেচে না। তিনি আমার বড় ছেলেটিকে চান। যদি রাজি হও, নগদ এক হাজার, কিন্তু ছেলেটিকে এ জন্মে, অন্ততঃ রামতারণ বাবু যত দিন বেঁচে থাক্‌বেন, ততদিন দেখ্‌তে পাবে না।"

মোক্ষদার নয়নযুগল বিস্ফারিত হইল। কি ভয়ঙ্কর প্রস্তাব! বক্ষের ক্ষীর-ধারায়, অন্তরের স্নেহ-সুধায় পালিত, নাড়ী-ছেঁড়া রত্নকে পরের হাতে জন্মের মত সঁপিয়া দিতে হইবে? ইহজন্মে তাহার সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না। হা অদৃষ্ট! আজ তাহাকে এমন কথাও শুনিতে হইল! পোড়া পেটের জন্য তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটিকে উপাড়িয়া ফেলিতে হইবে! রাক্ষসী ক্ষুধার তৃপ্তির নিমিত্ত সুমহান্, পবিত্র মাতৃত্বের গৌরব সে কেমন করিয়া বিসর্জ্জন করিবে! না—না! মোক্ষদা এত নিষ্ঠুর, এমন চণ্ডাল হইতে পারিবে না! বরং সে নিজে মরিবে।

শিবদাস পত্নীর মনের অবস্থা বুঝিল। পুত্রস্নেহ কত পবিত্র, কত মধুর, তাহা কি সে জানিত না? প্রাণ ধরিয়া

কোন্ পিতামাতা সন্তানকে জন্মের মত বিসর্জ্জন করিতে পারে? কিন্তু উপায় কি? দারিদ্র্য যে তাহাদিগকে প্রতিদিন নানারূপে লাঞ্ছিত করিতেছে!

শিবদাস বিষাদ-গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "মোক্ষদা, বড় কঠিন কাজ, তাহা আমি জানি। কিন্তু উপায় নাই। মৃত্যু তিল তিল করিয়া শিশু দু'টিকে গ্রাস করিতেছে, দেখিতেছ না? দুর্ভিক্ষের কবল হইতে উহাদিগকে বাঁচাইবার আর কোনও পথ নাই। এত চেষ্টা করিলাম, কোথাও একটা সামান্য বেতনেরও চাক্‌রী মিলিল না। দূরে গিয়া যে চেষ্টা করিব. সে সুবিধা ও সুযোগও নাই। তাহার উপর আমার স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তোমাকে এতদিন বলি নাই, কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আমার দুনিয়ার লীলা শেষ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। এখন ভাবিয়া দেখ, আমার অবর্ত্তমানে নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল অবস্থায় অপোগণ্ড শিশু দু'টিকে লইয়া তুমি বাঁচিবে কিরূপে? বাড়িখানিও বন্ধক. মাথা রাখিবারও যে স্থান পাইবে না। যদিও বা কোনরূপে বাঁচিয়া থাক, শিশু দুটি শিক্ষার অভাবে চোর-ডাকাত হইয়া উঠিবে। পেটের জ্বালা ভয়ানক। তার চেয়ে যদি একটির মায়া ত্যাগ কর, সে খাইয়া পরিয়া সুখে থাকিবে, লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবে। বিনিময়ে যে টাকা পাইবে, বুঝিয়া চলিলে, ঋণ শোধ দিয়াও ছোট ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিবে।"

দুই হস্তে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া মোক্ষদা বলিল, "উঃ! থাম, থাম, আর ও কথা বলিও না। এমন কাজ আমি কিছুতেই করিতে পারিব না। সে আমার নাড়ী-ছেঁড়া ধন, বুকের পাঁজরা!"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শিবদাস বলিল, "আচ্ছা, তবে থাক্। দাও, একটু তেল দাও, স্নান করে আসি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিস্তব্ধ রজনীর অন্ধকারে, ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিয়া মোক্ষদা আকাশ-পাতাল কি ভাবিতেছিল। সমগ্র বিশ্ব তখন সুপ্তিমগ্ন। বাতাস সমস্তদিন ছুটোছুটির পর তখন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মোক্ষদার দুই পাশে তাহার পুত্র দুইটি পরমনিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতেছিল। তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস-জনিত শব্দ ও স্বামীর নাসিকাগর্জ্জন অন্ধকারময় কুটীরের গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিতে ছিল। সকলেই সুপ্তিমগ্ন, কিছুক্ষণের জন্য সকলেই সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া একটু শান্তিলাভ করিতেছে, কিন্তু মোক্ষদার অদৃষ্টে আজ সে শান্তিও দুর্লভ। তাহার পোড়াচক্ষে নিদ্রা নাই!

দারিদ্র্য তাহাকে নানারূপে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার অপত্যস্নেহকে এত দিন স্পর্শ করিতে পারে

নাই। সহস্র দুঃখ-দৈন্যের শেলাঘাত সে অবিচলিতভাবে সহ্য করিয়াছে, অভাবের সহিত সে প্রতিদিন সংগ্রাম করিয়াছে। অপমানের বেদনা, ক্ষুধার তীব্র জ্বালা তাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু পুত্র দুইটির করুণমুখ দেখিলেই, তাহার সমস্ত জ্বালা জুড়াইত। তাহাদিগকে আদর করিয়া সে অনেক সময় তীব্র অসহনীয় ক্ষুধার যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু নির্ম্মম অদৃষ্ট আজ তাহার মাতৃত্বের গৌরবকেও ক্ষুন্ন ও চূর্ণ করিতে উদ্যত! তাহার নয়নের মণি, জীবনের ধ্রুব তারাটিকে তাহার দৃষ্টিপথ হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যগ্র! সে অতি দীন, অতি দরিদ্র, তাহার বিরুদ্ধে অদৃষ্টের এ নিষ্ঠুর চক্রান্ত কেন?

বড় পুত্রটি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মোক্ষদার স্নেহসিন্ধু উছলিয়া উঠিল। সে অতি সন্তর্পণে শিশুটিকে বুকের উপর তুলিয়া লইল। আঃ, কি স্নিগ্ধ স্পর্শ! বুক জুড়াইয়া যায়! এমন রত্নকে কে পরের হাতে তুলিয়া দিতে পারে? শিশু ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া শেষে মাতার স্নেহাতুর বক্ষের উপর আবার নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা গেল। মাতার বক্ষঃস্পন্দনের সহিত পুত্রের বক্ষঃস্পন্দন মিলিত হইল।

ওরে যাদু, ওরে সোনা, অঞ্চলের নিধি! কোন্ পাষাণী, কোন্ অভাগী তোর মত রত্নকে অগাধ জলে বিসর্জ্জন দিতে পারে? দুঃখিনী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া তোদের খাওয়াইবে, তবু তোরা মার কোল আলো করিয়া বসিয়া থাক্। যদি

একাণ্ডই মৃত্যু আসে, সকলে এক সঙ্গে মহাযাত্রা করিব। মোক্ষদা কি মৃত্যুকে ভয় করে ?

কিন্তু হায় ! মৃত্যু যে চির-বিশ্রাম, অনন্ত শান্তি ! দরিদ্র ত সে সুখের অধিকারী নয়। তাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে অভাব-জনিত তীব্র-যন্ত্রণা, মৃত্যুর কঠোর শেলাঘাত সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। সে ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা হইতে তাহার উদ্ধার লাভের আশা কোথায় ?

যামঘোষ প্রহরের পর প্রহর ঘোষণা করিয়া নীরব হইল। মোক্ষদার হৃদয়ে সমুদ্রমন্থন হইতেছিল, মাথায় আগুন জ্বলিতেছিল। চিন্তার শেষ নাই। সূত্রের পর সূত্র অবলম্বন করিয়া চিন্তাজাল বিস্তৃত হয়। মোক্ষদা ক্রমশঃ সূক্ষ্মতম চিন্তাজালে বিজড়িত ও বিব্রত হইয়া পড়িল।

সহসা কে যেন তাহার অন্তরের নিভৃততম স্থানে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া তাহার চিন্তাকে নূতন পথে পরিচালিত করিল। সে এতক্ষণ অন্ধ জননী-স্নেহে মুগ্ধ হইয়া কেবল নিজের কথাই ভাবিতেছিল। পুত্রের শুভাশুভ কি সে একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছে ? পুত্রের চির-অদর্শন, ভাবী বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার তীব্রতা অনুভব করিয়াই সে এতক্ষণ কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। পুত্রের মঙ্গলামঙ্গল সে মোটেই চিন্তা করে নাই। মাতৃস্নেহ নিঃস্বার্থ, মহান্ ও উদার। সে কি সেই উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছে ?

দারিদ্র্য মনুষ্যত্বলাভের প্রধান অন্তরায়। সেই চির-দারিদ্র্য, সীমাহীন অভাবের মধ্যে থাকিয়া তাহার পুত্র যদি জীবিত থাকে,

কিন্তু সে কি কখন মানুষ হইতে পারিবে?—অসম্ভব; যাহার উদরের ক্ষুধা দূর করিবার সামর্থ্য নাই, সে পুত্রকে সুশিক্ষিত করিবে কিরূপে? সুতরাং স্বামীর কথাই ঠিক। শিক্ষার অভাবে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে তাহার পুত্র, স্নেহের পুত্তলী শেষে পৃথিবীর ঘৃণ্য জীবে পরিণত হইবে? মা হইয়া সন্তানের সে শোচনীয় পরিণাম মোক্ষদা কেমন করিয়া দেখিবে, কিরূপে সহ্য করিবে? তার চেয়ে পরের হাতে সমর্পণ করা কি সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয় নয়? এক দিকে অন্ধস্নেহ, অন্য দিকে পুত্রের মান-সম্ভ্রম, বিদ্যা, অর্থ, নিরবচ্ছিন্ন সুখ। মোক্ষদা কোন্ দিক্ গ্রহণ করিবে? মানদণ্ড দুলিতেছে, মোক্ষদা! আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র বাছিয়া লও।

অভাগী দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। তার পর আগ্রহভরে সস্নেহে পুত্রের মুখচুম্বন করিল। হে শিব, হে সুন্দর, হে শক্তিময়! দুর্ব্বলের বল! তুমি মোক্ষদার হৃদয়ে শান্তি দাও! সে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিবে, নিজের সুখ সে চাহে না। সে পুত্রের সুখের অন্তরায় হইবে না। তাহার কল্যাণকল্পে সে আজ মাতৃত্বকে বিসর্জ্জন দিবে। স্নেহ, মায়া, মমতা! তোমরা মোক্ষদার হৃদয় হইতে দূর হও।

প্রভাতে উঠিয়া মোক্ষদা স্বামীকে বলিল, "তোমার কথাই ঠিক। আমাদের কাছে রাখিয়া মারিয়া ফেলা অপেক্ষা পরকে দেওয়া ঢের ভাল।"

শিবদাস দেখিল, পত্নীর নয়নযুগল আরক্ত, ঈষৎ স্ফীত, মুখমণ্ডল বিবর্ণ। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মলিন উত্তরীয়স্কন্ধে শিবদাস বাহিরে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

পূর্ণিমার সন্ধ্যা। আকাশের বক্ষে আলোকের উচ্ছ্বাস, পল্লীর শ্যাম অঞ্চলে জ্যোতির তরঙ্গ। মুকুন্দপুরের নবীন জমীদার শচীন্দ্রনাথ পাত্র-মিত্র সহ আলোক-চিত্রিত পুষ্পোদ্যানে বসিয়া সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতেছিল। লক্ষ্মীর বরপুত্র বীণাপাণির নির্ম্মাল্যলাভে বঞ্চিত বলিয়া একটি প্রবাদ আছে; কিন্তু শচীন্দ্র নাথ সে প্রবাদটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। চব্বিশ বৎসর বয়সে সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশের লোকের কাছে বাহবা লাভ করিয়াছিল। রামতারণ রায় জমীদারী ও বংশগৌরব রক্ষার ভার পালকপুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়া আজ এক বৎসর "অজানা রাজ্যে" চলিয়া গিয়াছেন। শচীন্দ্রনাথ এখন বিপুল সম্পত্তির কর্ণধার।

অর্থ মানবের স্থূল উন্নতির মূলমন্ত্র, সেটা ঠিক; কিন্তু সূক্ষ্ম বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সহায়তা করে কি? ভোগী বলিলেন, "হাঁ", ত্যাগী বলিলেন, "না।" তা যাহাই হউক না কেন, অর্থে মানুষের হৃদয় যে অসম্ভবরূপে স্ফীত হয়, মনুষ্যত্বটা যে

কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে, তাহার প্রমাণ তত বিরল নহে। আবার তাহার সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সংযোগ থাকিলে অবস্থাটা কিছু সঙ্গীন হইয়া দাঁড়ায়। উচ্চ-শিক্ষালাভে শচীন্দ্রনাথের দৃষ্টিটা কিছু উর্দ্ধগামী হইয়াছিল। উর্দ্ধ দৃষ্টি সকল সময়ে নিন্দার নহে, অবস্থাবিশেষে তারতম্য ঘটে। রামতারণ বাবু যশঃ বলিতে যাহা বুঝিয়াছিলেন, নবীন জমীদার তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাহার কীর্ত্তি যদি ঘোষিত না হইল তাহা হইলে সমস্তই মিথ্যা। শুধু গ্রামের লোকের প্রশংসায় তাহার তৃপ্তি হয় না। তাই সে একটা নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। যেখানে যত সভা সমিতি হইত, সে তাহাতে যোগদান করিত, এবং অযাচিতভাবে চাঁদার খাতায় দানের পরিমাণ শূন্যসংখ্যায় বাড়াইয়া দিত। তাহার এই ত্যাগস্বীকার ব্যর্থ হয় নাই। দেশীয় সংবাদপত্র-সমূহ তাহার এই বদান্যতার প্রশংসা করিয়া যাহা সুদ সমস্তই পরিশোধ করিয়াছিল। চাঁদার খাতার মাহাত্ম্য সামান্য নহে!

পারিষদবর্গ অন্যান্য দিনের ন্যায় আজিও নবীন জমীদারের গুণকীর্ত্তনে সন্ধ্যার বাতাসকে মুখরিত করিতেছিল। আলোক-স্নিগ্ধ মধুর সন্ধ্যায় শচীন্দ্রনাথের তাহা মন্দ লাগিতেছিল না। চারি দিকে ফুলের ঘন সুগন্ধ, উপরে চন্দ্রকরধৌত নীল-শূন্য, দীঘির কালো জলে হীরকহিল্লোল! এমন মনোরম, স্বপ্নময় সন্ধ্যায় যশোগান কাহার অন্তরকে না অভিভূত করিয়া ফেলে? বৈঠক বেশ জমিয়া আসিয়াছে, এমন সময় কাছারীগৃহের

সম্মুখে একটা গোল উঠিল। বেজায় বদরসিক ত! কে এমন সময় গোল করিতেছে? শচীন্দ্রনাথ বিরক্ত হইল, পারিষদবর্গ চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপার কি, জানিবার জন্য তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল।

ম্যানেজারকে প্রশ্ন করিয়া শচীন্দ্রনাথ জানিতে পারিল, তাহার ভিটাবাড়ীর প্রজা ভজহরি, সর্ব্বানন্দঠাকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট তৈজসপত্র বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা ধার লয়। যে জিনিস দেখাইয়া ভজহরি টাকা লইয়াছিল, ব্রাহ্মণ সেগুলি ভজহরির কাছেই বিশ্বাস করিয়া রাখিয়া দিযাছিলেন। নিজের বাড়ী লইয়া যান নাই। লুব্ধ ভজহরি এদিকে আব এক জন পোদ্দারের নিকট পুনরায় বাসনাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা লয়। পোদ্দার ব্রাহ্মণের ন্যায় নির্ব্বোধ নহে; সে জিনিসগুলি নিজের হেপাজতে রাখিবে বলিয়া ভজহরির গৃহে উপস্থিত হয়। এ দিকে ব্রাহ্মণ লোকমুখে ভজহরির ব্যবহারের কথা অবগত হইয়া তাহাকে মাল সহ গ্রেপ্তার করিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার টাকা শোধ না দিলে একটি জিনিসও ছাড়িবেন না। গোলযোগ পাকিয়া উঠিল। শেষে ব্যাপারটা পুলিস পর্য্যন্ত গড়াইবার উপক্রম হইল। ভজহরি তখন জমীদারের সহায্য প্রার্থনা করিল। ম্যানেজার বিষয়টা অপোস-নিষ্পত্তি করিবেন বলিয়া ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দেলেন। সর্ব্বানন্দ ঠাকুর জমীদারের কাছে ন্যায় বিচার পাইবেন ভাবিয়া সমস্ত দ্রব্য ছাড়িয়া দিযাছেন। সেই বিষয়ের মীমাংসা উপলক্ষে এই কলরব।

শচীন্দ্র বলিল, "কিরে ভজা, মিছে গোলমাল কচ্ছিস্ কেন ?"

জমীদারকে সম্মুখে পাইয়া ভজহরির সাহস হইল। শচীন্দ্র তাহাকে একটু ভালবাসিত। সে বলিল, "হুজুর, ঠাকুর অন্যায় গোল বাধাচ্ছেন। ওঁর কাছে আমি যে জিনিস বন্ধক রেখেছিলাম, সে সব আমার ঘরে আছে। এ জিনিস আলাদা।"

ব্রাহ্মণ বিরক্তভাবে বলিলেন, "ভজহরি, কেন মিথ্যা কথা বলিস্? তখন তুই ঘরের সব বাসনপত্র না দেখাইলে কি আমি তোকে অত টাকা দিতাম? তোকে বিশ্বাস করাই আমার ভুল হয়েছিল।"

অমাত্যবর্গের মধ্য হইতে এক জন বলিল, "আচ্ছা ভজ, তোর ঘরে এখন অন্য বাসনপত্র আছে?"

"আজ্ঞে, কেন থাক্‌বে না? আমার সঙ্গে পাইক দিন। যদি না নিয়ে আস্‌তে পারি, আমায় দু'শ জুতা মার্‌বেন।"

তখন সকলে সেই প্রস্তাবে সায় দিল। পোদ্দার বলিল, "বাবু, তা হলে আমায় আর কেন কষ্ট দেন, আমার জিনিস নিয়ে চলে যাই?"

ভজহরি বলিল, "পোদ্দার মশায়, তুমি তোমার জিনিস নিয়ে যাও। শুধু শুধু তুমি কেন বসে থাক্‌বে? গোল ত মিটে গেল।"

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, ব্যাপার বড় সুবিধাজনক নহে। সকলেই ভজহরির পক্ষ। তার ঘরে বাসনপত্র বেশী নাই। কেবল

মিথ্যা গুজব করিতেছে। ব্যবহারের জন্য যা দুই চারিখানা বাসন আছে, তাহাই দেখাইয়া তাহাকে ফাঁকি দিবে। তাহার টাকা ও জিনিষ সমস্তই গেল। তখন সর্ব্বানন্দ ঠাকুর চীৎকার করিয়া বলিলেন, "খবরদার ও জিনিসে কেউ হাত দিও না; ভাল হবে না বল্‌ছি। বিচার এখনও শেষ হয় নি।"

ব্রাহ্মণ যে ভাবে কথাটা বলিলেন, শচীন্দ্রনাথ তাহার অর্থ ভিন্নভাবে গ্রহণ করিল। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের এতবড় স্পর্দ্ধা, তাহার সম্মুখে তাহারই প্রজাকে বড় গলা করিয়া তর্জ্জন করে? জমীদারের তরল রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল। সে ভজহরিকে সমস্ত জিনিস তুলিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিল।

সর্ব্বানন্দ বিস্মিত হইলেন। জমীদারের মুখে এই আদেশ? সহস্র সহস্র প্রজা যাহার মুখ চাহিয়া সুবিচারের প্রত্যাশা করে, তাহার এই ব্যবহার? এই বিচারের প্রত্যাশায় তিনি জমীদারের কাছে আসিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "বাবু, তা হলে আমার টাকার উপায়?"

"তা আমি কি জানি? তোমার পাওনা থাকে, আদালত খোলা আছে।"

"এই কি আপনার যোগ্য কথা? এই কি ন্যায়-বিচার?"

"থাম ঠাকুর, বেশী বকিও না। তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার প্রজার উপর হুকুম চালাও? কি বল্‌ব—তুমি ব্রাহ্মণ, নহিলে উচিত শাস্তি পেতে। এখন মানে মানে চ'লে যাও।"

হতবুদ্ধি ব্রাহ্মণ কাতরভাবে সকলের মুখের পানে চাহিলেন। তাঁহার বোধ হইল, সকলেই যেন তাঁহার লাঞ্ছনায় আনন্দ উপভোগ করিতেছে। এই কাছারীগৃহে, এই স্থানে বসিয়া স্বর্গীয় প্রাতঃস্মরণীয় রামতারণ বাবু ধনী, দরিদ্র, সবল, দুর্ব্বল, সকলের প্রতি ন্যায়-বিচার করিয়াছেন। আজ সেই পবিত্র আসনের উপর দাড়াইয়া, তাঁহার পুত্র ন্যায়ের মর্য্যাদাকে পদ-দলিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না! আবেগরুদ্ধ-কণ্ঠে সর্ব্বানন্দ বলিলেন, "আপনার পিতা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, ভালবাসিতেন। তাঁহার কাছে সকলেই সুবিচার পাইত। আপনিও সুশিক্ষিত, আপনার কাছেও ন্যায়-বিচার হইবে, সেই বিশ্বাসে আমি মাল ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। নহিলে সর্ব্বানন্দ শর্ম্মাকে ভয় দেখাইয়া বা ঠকাইয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ জিতিয়া যায় নাই। কিন্তু আপনি আজ আমায় ভাল শিক্ষা দিলেন।"

সত্য চিরকালই অপ্রিয়। অপ্রিয় সত্য কথায় শচীন্দ্রনাথের রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। আরক্ত-মুখে, ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে সে বলিল, "তুমি চ'লে যাও, এখনই যাও। ফের যদি কথা কও, দরোয়ান গলা ধাক্কা দিয়ে তোমায় তাড়িয়ে দেবে।"

আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণ লাফাইয়া উঠিলেন। অপমানে, ক্ষোভে, ক্রোধে তাঁহার মস্তকের শিখা কণ্টকিত হইল। তীব্রকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "শচীন্দ্র বাবু, তুমি আজ আমায় যে কথা বলিলেন, যাঁর বিষয়ের এখন তুমি মালিক, তিনিও সে রকম কথা কোনও ব্রাহ্মণকে কখনও বলিতে সাহস করেন নাই।

আজ যদি তাঁর ঔরস পুত্র থাকিত, সেও এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না। তুমি কলমের চারা, তোমার কাছে লোকে আর কত প্রত্যাশা করিবে? গরীবের ছেলে, টাকা ত কখন দেখ নাই; সেই অহঙ্কারে তুমি ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছ। কিন্তু মনে রেখ, তোমার বাবা টাকা নিয়ে তোমায় বেচেছিল।"

পারিষদবর্গ গর্জ্জিয়া উঠিল। তেওয়ারী, পাড়ে, মিছির লাঠী হাতে দৌড়িয়া আসিল। ক্রোধান্ধ শচীন্দ্রনাথের আদেশে ব্রাহ্মণের গলায় জুতার মালা বিলম্বিত হইল। এই অন্যায় অসঙ্গত আচরণের বিরুদ্ধে কেহ একটি কথাও উচ্চারণ করিল না।

সেই রাত্রেই শচীন্দ্রনাথ কলিকাতা-যাত্রার আয়োজন করিল। পল্লীর বাতাস তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুদূর নগর ও পল্লীপ্রান্ত হইতে সমাগত অসংখ্য ভক্তের মর্ম্মোত্থিত মাতৃ-নাম-গানে সমগ্র কলিকাতা, সহর-তলী পরিপ্লাবিত। বহুকাল পরে অর্দ্ধোদয় যোগ আসিয়াছে। তাই ভক্ত হিন্দু পুণ্য-স্নানের আশায় ছুটিয়াছে। বহু বার বহু যোগ বঙ্গদেশে দেখা দিয়াছে, কিন্তু এমন যোগ বুঝি কখনও আসে নাই। বাঙ্গালী যে মানুষ, তাহাদের হৃদয় যে চিরসুপ্তির মায়া-

জালে আচ্ছন্ন নহে, পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন যে সম্ভব, এই অর্দ্ধোদয়-যোগে তাহার কি প্রকৃষ্ট পরিচয়!

পীত-উষ্ণীষধারী, লগুড়-হস্ত, স্বেচ্ছাসেবক যুবকের দল রাজপথের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছিল। তাহাদের আনন আনন্দ-কিরণে উদ্ভাসিত, হৃদয়ে অদম্য আশা, বাহুতে শক্তি। তাহাদের পানে চাহিলেই যেন মনে হয়, তাহাদের উজ্জ্বল-নয়ন বলিতেছে, "হে দুর্ব্বল হে আর্ত্ত, হে পীড়িত! তোমাদের ভয় নাই; আমরা আসিয়াছি। মাতৃনামের পবিত্র মন্ত্রে আমরা দীক্ষিত। মাতৃযজ্ঞের অর্ঘ্যভার আমরা আহরণ করিতেছি। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আশ্বস্ত হও; আমাদের উপর নির্ভর কর। আমরা থাকিতে তোমাদের কোন অমঙ্গল ঘটিবে না।"

রাজপথে জনস্রোত, পল্লীর মধ্যে যাত্রিপ্রবাহ, চতুর্দ্দিকে আনন্দোচ্ছ্বাস। স্বেচ্ছা-সেবকগণ যাত্রিভবনের স্বাস্থ্য, লোকের গমনাগমনের ব্যবস্থা ও যাত্রিবৃন্দের অভাব-অভিযোগের প্রতীকারের নিমিত্ত আগ্রহভরে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছিল। আজ দেশের কল্যাণ-কল্পে, সমাগত দেশবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাহাদের হৃদয়ে কি গভীর ত্যাগ-স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে!

শঙ্খধ্বনি-ব্যাকুল, জয়ধ্বনি-মুখর শীতার্ত্ত মাঘের প্রভাতে, বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে কোনও যাত্রি-কুটীরের মলিন শয্যাপ্রান্তে বিসূচিকা-পীড়িত একটি যাত্রী যুবক যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছিল। পার্শ্বে বৃদ্ধা মাতা ব্যাকুলভাবে তাহার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। আজ তিন দিন হইল, তীর্থস্নান উপলক্ষে তাহারা

কালীঘাটে আসিয়াছে। তাহাদের সহিত তৃতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না। এই তাহাদের প্রথম কলিকাতা দর্শন।

ক্ষীণকণ্ঠে যন্ত্রণাভরে পুত্র বলিল, "জল—প্রাণ যায়, মা!"

বৃদ্ধা অশ্রুপ্লাবিতনেত্রে পুত্রের মুখে একটু জল দিল। হা ভগবন্, এ কি হইল! তাহার অন্ধের যষ্টি, সংসারের একমাত্র বন্ধন, সেও বুঝি চলিয়া যায়! বিনা চিকিৎসায় শুশ্রূষার অভাবে পুত্র মরিবে? দুঃখিনীর আর যে কেহ নাই। ভগবানের অলঙ্ঘনীয় বিধানবশে আপনার জন পর হইয়াছে। স্বামী কালের আহ্বানে হাজিরা দিতে গিয়াছেন, শেষে অবলম্বন যেটি, সেও শেষে ফাঁকি দিবে?

ওগো, কে কোথায় আছ, একবার এস। একটু সাহায্য কর। বিধবার দুঃখিনীর রত্ন বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছে। কেহ নাই—কেহ নাই! যাত্রীরা সকলেই যোগস্নানে ব্যস্ত। দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া জয়ধ্বনি ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল।

"মা! গেলুম, আর বুঝি বাঁচি না।"

হায়, অক্ষম! হায়, দুর্ব্বল! তোমার মৃত্যু অগ্রে ঘটিল না কেন? মা হইয়া পুত্রের এ যন্ত্রণা কেমন করিয়া নীরবে সহ্য করিব? বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে বেদনা-দীর্ণ কণ্ঠস্বরে শোকতপ্ত দীর্ঘশ্বাসে অন্ধকারময় কুটীর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

ও কে? ও কারা? মূর্ত্তিমতী আশার ন্যায়, পীত-উষ্ণীষ-শোভিত কয়েকটি যুবক দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ

করিল। তাহাদের বক্ষে "বন্দে-মাতরম্"-চিহ্নিত পবিত্র কবচ দীপ্তি পাইতেছিল। শোক-মুগ্ধা মাতাকে ধীরে ধীরে সরাইয়া দিয়া তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে পীড়িতের পার্শ্বে উপবেশন করিল। শুশ্রূষা আরম্ভ হইল। তাহাদের মধ্যে এক জন ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল, অশ্রুসিক্তনয়নে, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "তোমরা কারা, বাবা?"

"আমরা আপনারই সন্তান। ভয় নাই মা, আপনার ছেলের কোনও ভয় নাই। আপনি কাঁদবেন না।"

কি স্নিগ্ধ আশাময় কণ্ঠস্বর! কি বিনয়-নম্র ব্যবহার! এই সব দেব-শিশুর জননীরা কি ভাগ্যবতী! বৃদ্ধা মুক্তকণ্ঠে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

স্বেচ্ছা-সেবকদলের এক জন বিচক্ষণ ডাক্তার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, "মা, আপনার ছেলেকে আমরা এখান থেকে নিয়ে যাব। এখানে ভাল সেবা শুশ্রূষা হবে না। রোগ বাড়িতে পারে। আপনার ভয় নাই, উনি শীঘ্র সেরে উঠ্‌বেন। কিন্তু আপনাকেও এখান থেকে যেতে হবে। নিকটে কোথাও যদি আপনার কোনও আত্মীয় থাকেন, তবে আপনার সেখানে যাওয়াই উচিত। আমরাই আপনাকে সেখানে রেখে আস্‌ব। তার পর আপনার ছেলে আরাম হ'লে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। আপনি কোনও চিন্তা কর্‌বেন না।"

বৃদ্ধা পীড়িত পুত্রকে চক্ষের অন্তরাল করিতে কোনও মতেই সম্মত হইল না। কিন্তু যখন সকলে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, স্থানান্তরিত না করিলে রোগীর প্রাণরক্ষার আশা নাই, এবং যেখানে তাহাকে রাখা হইবে, বৃদ্ধার তথায় থাকিবার কোনও সুবিধা নাই, তখন অগত্যা তাঁহাকে সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল।

রোগী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "মা, তুমি আমার জন্য ভাবিও না। তুমি যাও। আমার কোনও কষ্ট হবে না।"

ডাক্তার বলিলেন, "আর দেরী করা উচিত নয়। আপনার আত্মীয়ের ঠিকানা ব'লে দিন, সেইখানে রেখে আসি। কোনও চিন্তা নাই। আমি রোজ সেখানে আপনার ছেলের খবর পাঠিয়ে দেব।"

বৃদ্ধা পুত্রের পানে চাহিলেন। পীড়িতের তখন কথা বলিতে কষ্ট বোধ হইতেছিল, তথাপি সে অতিকষ্টে বলিল, "ভবানীপুরে মুকুন্দপুরের এক জন জমীদার আছেন, মাকে সেইখানে পাঠিয়ে দিন।"

"কে, শচীন্দ্রনাথ রায়? তা এতক্ষণ বল্‌তে হয়! তিনি যে আমাদের দলের এক জন প্রধান পাণ্ডা।"

তৎক্ষণাৎ পাল্‌কী আসিল। রোগীকে পীড়িতদিগের ক্যাম্পে পাঠান হইল। ভলণ্টিয়ার বালকেরা বৃদ্ধাকে জমীদার শচীন্দ্রনাথ রায়ের গৃহে পঁহুছিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ওঃ, কতকাল পরে! দীর্ঘ একুশ বৎসর সে তাহাকে দেখে নাই। সেই তিন বৎসরের শিশু আজ কত বড়ই হইয়াছে! তখন সে মাতার কোলের উপর খেলা করিয়া বেড়াইত। এখন বিশ্ব-জননীর কোল তাহাকে আহ্বান করিতেছে! আজ সে ঐশ্বর্য্যে, সম্পদে, শিক্ষায়, জ্ঞানে ও মানে লোকপূজ্য, মহামহিমান্বিত! কিন্তু সে ত এই সুখ, এই তৃপ্তির কোনও অংশ পায় নাই। নিজের পেটে ধরিয়াও সে আজ মাতার অধিকার হইতে বঞ্চিত, সে যেন নিতান্ত অপরিচিত, পথের পথিক! নিকটে থাকিয়াও কত দূরে! ধমনীর প্রতি শোণিত-বিন্দু, শরীরের প্রত্যেক অস্থি মাতার শরীর হইতে গঠিত, কিন্তু তথাপি আজ পুত্রের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই! সম্বন্ধ কি নাই? রক্তমাংসের সম্পর্ক কি দেহ থাকিতে লুপ্ত হয়? পৃথিবীর কোন্ শাস্ত্রে এ কথা লেখা? তা না থাক্, তাহার পুত্র ত সুখী হইয়াছে। আজ যে যশঃ, যে সম্মান, যে ঐশ্বর্য্যের সে অধিকারী, মোক্ষদা এতখানি ত্যাগস্বীকার না করিলে, পুত্রের অদৃষ্টে কি তাহা ঘটিত? অবশ্য জননীর হৃদয় তাহাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে সত্য। দীর্ঘ একুশ বৎসরের মধ্যে এক রাত্রিও সে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতে পারে নাই। প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত্তে, শিশুর সুকুমার শান্ত মধুর মুখখানি তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত; নিমেষের জন্যও সে

মূর্ত্তি সে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। দীর্ঘ-বিচ্ছেদের পর আজ সে স্নেহের ধনকে দেখিতে পাইবে! আনন্দ-উচ্ছ্বাস বৃদ্ধার জীর্ণ হৃদয়কে প্লাবিত করিল। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধার চমক ভাঙ্গিল। তাহার আশঙ্কা হইল, পুত্র ও কখনও মাতৃস্নেহ লাভ করে নাই, তাহাকে দেখে নাই। যদি সে তাহাকে উপেক্ষা করে? তা করুক, কিন্তু সে ও পুত্রকে দেখিয়া তাহার হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে পারিবে।

একটি পরিচারিকা কলতলায় বাসন মাজিতেছিল। সে বৃদ্ধাকে দেখিয়া বলিল, "কোথা থেকে আসছ গা?"

ঝির কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া একটি বর্ষীয়সী বিধবা অঙ্গনে আসিয়া দাড়াইলেন। অপরিচিতা বৃদ্ধাকে দেখিয়া বলিলেন, "কাকে খোঁজ? তোমার বাড়ী কোথায়?"

হা অদৃষ্ট! আজ পুত্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া, ভিখারীর ন্যায় তাহাকে আত্মপরিচয় প্রকাশ করিতে হইতেছে? বৃদ্ধার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া সে উত্তর করিল, "আমাদের বাড়ী পরাণপুর। মুকুন্দপুরের কাছে।"

"পরাণপুরে? তোমরা কারা?

বৃদ্ধা এবার নয়ন বস্ত্রাবৃত করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বিধবা মহিলা স্বর্গীয় রামতারণ বাবুর পত্নী। তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধার হাত ধরিয়া তাহাকে এক প্রান্তে লইয়া গেলেন।

কথাটা তখন প্রকাশ পাইল। রামতারণের বিধবা বৃদ্ধাকে আশ্বস্ত করিলেন। শচীন্দ্র ভিতরে আসিলে তাহার কাছে মোক্ষদাকে লইয়া যাইতে অঙ্গীকার করিলেন। রমণী-হৃদয়ের বেদনা রমণী অতি সহজেই বুঝিতে পারে।

স্নানান্তে শচীন্দ্রনাথ যখন কেশ-প্রসাধনে নিবিষ্টচিত্ত, সেই সময়ে রামতারণের বিধবা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, "শচী, তোর গর্ভধারিণী মা তোকে দেখ্‌বার জন্য এসেছে।"

কে? গর্ভধারিণী! সে আবার কে? শচীন্দ্র এরূপ কোনও ব্যক্তিকে ত চেনে না। সে জানে, তাহার মা নাই। জননীর স্নেহক্রোড় তাহাকে শৈশবেই ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। অর্থের লোভে যে পিশাচী সন্তান বিক্রয় করিতে পারে, সে ত মা নহে, সে যে রাক্ষসী। শচীন্দ্র তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে।

রামতারণের বিধবা মমতা-মধুর-কণ্ঠে বলিলেন, "আহা মার প্রাণ কত কাল দেখেনি; সন্তানের মায়া কি ভোলা যায় বুড়ীর কি কষ্ট!"

কষ্ট? যে পুত্রস্নেহ পদদলিত করিয়া সন্তানকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিতে পারে, তার কি হৃদয় আছে যে, কষ্ট হইবে? অন্যে বিশ্বাস করে করুক, কিন্তু শচীন্দ্র এমন অন্যায় বিশ্বাস করিতে আদৌ প্রস্তুত নহে। কি আশ্চর্য্য! সকল সংস্রব যাহার সহিত চিরদিনের নিমিত্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে,

আজ লজ্জার মাথা খাইয়া সে আবার তাহাকে মুখ দেখাইতে আসে কোন্ অধিকারে? তাহার কি এতটুকু সঙ্কোচ বোধ হইল না? এমনই ইতর, নির্লজ্জ, ঘৃণ্য জীবের উদরে শচীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছে!

শচীন্দ্রের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; নয়নযুগল হইতে ক্রোধ, ঘৃণা ও ক্ষোভজনিত অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। এক এক করিয়া সকল কথা তাহার স্মৃতিপটে উদিত হইল। ব্রাহ্মণের তীব্র শ্লেষবাণী সে অতিকষ্টে বিস্মৃত হইয়াছিল, আজ ইন্ধন পাইয়া মর্ম্ম-বেদনার জ্বালাময়ী শিখা দ্বিগুণতেজে জ্বলিয়া উঠিল। নিদারুণ ঘৃণা, বিজাতীয় ক্রোধে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল।

তীব্রস্বরে শচীন্দ্র বলিল, "এখনি তাকে বিদায় ক'রে দাও। এক মুহূর্ত্তও যেন সে আমার বাড়ীতে না থাকে। তার সঙ্গে আমার কোনও সংস্রব নাই।"

রামতারণ বাবুর পত্নী সবিস্ময়ে তাহার পানে চাহিলেন। "কি বল্‌ছিস্, শচী? কাকে ও কথা বল্‌ছিস্, তা ভেবে দেখেছিস্? সে যে তোর মা—গর্ভধারিণী! দশ মাস দশ দিন পেটে ধরেছিল!"

"তুমি এখনই তাকে তাড়িয়ে দাও। বেশী কথা বলো না। আমি তার মুখ দেখ্‌তে চাইনে। সে রাক্ষসী আমার কেউ নয়।"

মোক্ষদা পুত্রকে দেখিবার আশায় স্পন্দিতহৃদয়ে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শচীন্দ্রের সমস্ত কথাই তাহার

কাণে গিয়াছিল। বৃদ্ধা স্তম্ভিতভাবে দরজার কবাট ধরিয়া দাঁড়াইল। এই কি তাহার পুত্র? যাহার মঙ্গল-কামনায় সে আপনার হৃৎপিণ্ডকেও উৎপাটিত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই স্নেহের ধন, পুত্রের মুখে এই নিদারুণ মর্ম্মভেদী তিরস্কার! দারিদ্র্যের নির্ম্মম নিষ্পেষণে মনুষ্যত্ব লুপ্ত হইবার আশঙ্কায় সে যে পুত্রকে পরের হাতে বিসর্জ্জন করিয়াছিল, এই কি তাহার পরিণাম? শিল্পী সারা জীবনের সাধনাফলে হীরক, প্রবাল, মণিমুক্তায় মণ্ডিত অপূর্ব্ব হিরণ্ময়ী প্রতিমা গঠন করিয়াছে সত্য, কিন্তু হায়! প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।

অসহনীয় যন্ত্রণায় মোক্ষদার শোকতাপ-জীর্ণ হৃদয় বিদীর্ণ হইতে চাহিল। তাহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে পৃথিবীর সমস্ত আলোক যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল।

রামতারণ-পত্নী মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঐ তোর মা এসেছে, একটু চুপ্ কর্ বাবা!"

শচীন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে বলিল, এখানে এসেছ কেন? এখানে কিছু হবে না, এখনই চলে যাও। ভিক্ষার দরকার হয়ে থাকে অন্য জায়গায় যাও। দাঁড়িয়ে রৈলে যে?"

মোক্ষদা! মোক্ষদা! পালাও, আর কেন? দূরে, বহু দূরে লোকালয়ের শেষ সীমায় পলায়ন কর! অবোধ রমণী! তুমি কেমন করিয়া জানিবে, মাতার স্নেহক্রোড় হইতে যে হতভাগ্য বিচ্যুত, জননীর অনন্ত, অকৃত্রিম স্নেহধারা যাহার হৃদয়কে পবিত্র করে নাই, সে সম্রাটের ঐশ্বর্য্য, প্রভুত

ধন-সম্পদের মধ্যে থাকিয়াও কদাচিৎ মানুষ হইয়া উঠিতে পারে!

রামতারণের বিধবা কাতরভাবে বলিলেন, "ও শচী তুই করিস্ কি? বুড়ী যে সারাদিন উপবাসী, তার ছোট ছেলেটি মরণাপন্ন। এমন কাজ করিস্ না। দুপুরবেলা একটা অতিথি এলেও লোক তাকে না খাওয়াইয়া ছেড়ে দেয় না। আর তোর গর্ভধারিণী মাকে এমন সময় তাড়িয়ে দিচ্ছিস্?"

মোক্ষদা মুখের মধ্যে বস্ত্রাঞ্চল চাপিয়া মর্ম্মভেদী চীৎকার রুদ্ধ করিল। চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বহির্গত হইতে চাহিল। প্রাণপণ চেষ্টায় মাতা চক্ষের জল রুদ্ধ করিল। তাহার একটি দীর্ঘশ্বাসে শচীন্দ্রের সমস্ত কল্যাণ ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে যে! এক ফোঁটা চোখের জলে পুত্রের সমস্ত সম্পদ্ ভাসিয়া যাইবে! মোক্ষদা কি তা পারে? সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিল।

পশ্চাৎ হইতে রামতারণ-পত্নী বলিলেন, "দিদি, যেও না, তোমার পায়ে পড়ি, দাঁড়াও। ফের, ফের, পাষণ্ডের কথা তুমি ধরিও না। আমার মাথা খাও, ফের। যাঃ! চ'লে গেল? হায়! হায়? এ কি হ'ল!"

মর্ম্মপীড়িতা, উপেক্ষিত জননী পশ্চাদ্দ্বার দিয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন জয়ধ্বজা উড়াইয়া "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে স্বেচ্ছাসেবক যুবকগণ ভিন্নপথে শচীন্দ্রনাথের গৃহে প্রবেশ করিতেছিল।

পূজার অর্ঘ্য।

মুক্তিমুমুক্ষু স্বদেশভক্ত, লাঞ্ছিতা গর্ভধারিণীর মর্ম্মভেদী তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রুজলের ভিত্তির উপর বঙ্গলক্ষ্মীর স্বর্ণমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবে, উপেক্ষিতা ক্ষুৎপিপাসাতুরা জননীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া বঙ্গ-মাতার পূজার অর্ঘ্য রচনা করিবে! হা দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ!

দেবী।

—*—
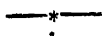
প্রথম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "পীড়া গুরুতর, কিন্তু চিকিৎসার অতীত নহে। তবে কিছু সময় লাগিবে। সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত শুশ্রূষাও আবশ্যক।"

কম্পিত কণ্ঠে হরিমোহন বাবু বলিলেন, "সমস্ত ভার আপনার উপর। আমার একটি মাত্র কন্যা। যাহাতে সে শীঘ্র সারিয়া উঠে, সে জন্য আপনি যেমন আদেশ করিবেন, সেবা শুশ্রূসা সেই ভাবেই চলিবে।"

ডাক্তার বলিলেন, "এসব রোগের শুশ্রূষার জন্য একজন ভাল ধাত্রীর আবশ্যক। আমি মিস্ বসুকে বলিয়া যাইতেছি। সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রসূতির কাছে থাকিতে হইবে। এ সকল কার্য্যে তাঁহার বেশ দক্ষতা আছে। সম্ভবতঃ তিনি কোন আপত্তিও করিবেন না। অনেক সময় তিনি অযাচিত ভাবে পীড়িতের সেবা করিয়া থাকেন।"

রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। ঊষার তরুণ আলোকচ্ছটা বাতায়ন পথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। মুঙ্গেরের রাজপথে দুই একটী লোক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দেবী।

হরিমোহন বাবু বলিলেন, "আমার জামাই রেঙ্গুনে চাকরী করেন। তাঁহাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করা আবশ্যক বিবেচনা করেন কি?"

"এখনই তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিবার আবশ্যক নাই। ভগবান্ না করুন, তাহাকে সংবাদ দিবার প্রয়োজন হইলে পূর্ব্বেই আপনাদের বলিব।"

ডাক্তার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিদায় লইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দীর্ঘ দিনগুলি কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এবং কখন রাত্রির পর প্রভাত ও প্রভাতের পর আবার রাত্রি আসিতেছিল, মৃণালিনীর তাহা জানিবার শক্তি ছিল না।

কোনও কোনও রোগে অবস্থা বিশেষে সমস্ত ইন্দ্রিয় একটা স্বপ্নে, একটা তন্দ্রাজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানের উপর এমন একটা যবনিকা পড়িয়া যায় যে, দুর্ব্বল ইচ্ছাশক্তি কিছুতেই সেই স্বপ্নজাল হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না।

মৃণালিনী কেবল স্বপ্ন দেখিত। স্বপ্নের পর স্বপ্ন—বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন অর্থহীন স্বপ্ন! সেই স্বপ্নে সে দেখিতে পাইত,

যেন এক স্নেহময়ী দেবীমূর্ত্তি নিরন্তর তাহার পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেছেন। তাঁহার সুন্দর মুখে সেবাপরায়ণা মাতৃমূর্ত্তির অপূর্ব্বশ্রী; সুধাস্নিগ্ধ স্বরে করুণা উছলিয়া উঠিতেছে।

স্বপ্নের পর গাঢ় নিদ্রা, তারপর কি শান্তিপূর্ণ জাগরণ! মৃণালিনী চাহিয়া দেখিল, সে তাহারই পরিচিত শয়নকক্ষে শয়ানা।

গৃহমধ্যে টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে। সেই প্রজ্বলিত দীপাধারের সম্মুখে আনতমুখে তাহারই স্বপ্নদৃষ্ট রমণী-মূর্ত্তি উপবিষ্ট। মৃণালিনী তাহার দুর্ব্বল শীর্ণ হাত দুই খানি তুলিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলিল। এখনও কি তাহার দৃষ্টির উপর স্বপ্নের ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে?

অলঙ্কারনিক্কণ শুনিয়া অধ্যয়নরতা রমণী রুগ্নার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ধাত্রী মিস্ বসু বলি-লেন, "এখন কি একটু সুস্থবোধ করিতেছেন?"

মৃণালিনী তাহার শীর্ণ হস্তের দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আমার কি ভারি অসুখ করিয়াছিল? কতক্ষণ আমি অজ্ঞান ছিলাম?"

ধাত্রী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আজ পনের দিনের পর আপনার চৈতন্য হইয়াছে। একবার হাতটা দিন ত দেখি?"

মিস্ বসু নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পনের দিন! এত দিন তাহার জ্ঞান ছিল না! ঘুরিয়া ফিরিয়া মৃণালিনীর দৃষ্টি তাহার বিস্তৃত শয্যাপার্শ্বে এক রাশি

মল্লিকা ফুলের মত একটী ক্ষুদ্র ঘুমন্ত শিশুর উপর স্থাপিত হইল। অমনই একটা বিচিত্র বেদনা, অপূর্ব্ব রাগিণী তাহার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অনিমেষ নয়নের স্নিগ্ধ উৎফুল্ল দৃষ্টি খোকার প্রত্যেক অঙ্গ যেন আলিঙ্গন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার সকল কথা স্মরণ হইল। এক দিন গভীর রজনীতে একটা তীব্র বেদনায় তাহার সমুদয় ইন্দ্রিয় অভিভূত হইয়াছিল; প্রদীপের আলোক চক্ষের উপর হইতে নিভিয়া গিয়াছিল, সে কথা এখন তাহার বেশ মনে পড়িল।

মৃণালিনী সবিস্ময়ে বলিল, "এই পনের দিন তবে আপনি দিনরাত আমার পাশে বসিয়াছিলেন! আমি স্বপ্নে কেবল একটি দেবীমূর্ত্তি দেখিয়াছি। সে সব তা' হ'লে মিথ্যা নয়?"

একটি পাত্রে ঔষধ ঢালিয়া মিস্ বসু বলিলেন, "এই ঔষধটা খাইয়া আর একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করুন। আজ আর বেশী কথা বলিবেন না। বোধ হয় আর জ্বর আসিবেনা।"

মৃণালিনী ধীরে ধীরে খোকার দিকে পাশ ফিরিয়া শুইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দিন দিন মৃণালিনী আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। তাহার রক্তহীন পাণ্ডুর কপোলে স্বাস্থ্যের কোমল আভা আবার ফিরিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এখনও সে শয্যা ছাড়িয়া বেশী দূর যাইতে পারে না।

মিস্ বসু প্রত্যহ মধ্যাহ্নে তাহার কাছে আসিতেন। গল্প গুজবে, হাস্য গানে, তিনি মৃণালিনীর অবসন্ন হৃদয়তন্ত্রীতে একটা আনন্দের সুর বাঁধিয়া দিতেন।

এই নবপরিচিত শান্তমূর্ত্তি যুবতীর স্নিগ্ধহাস্যে, অপরূপ স্নেহে, সুসঙ্গত শ্রুতিমধুর কথপোকথনের বিচিত্র মোহে অল্প দিনের মধ্যেই মৃণালিনী এত আকৃষ্ট, আবিষ্ট হইয়া পড়িল যে, কোন দিন তাঁহার আসিতে একটু বিলম্ব হইয়া গেলে সে উন্মনা হইয়া জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। তাহার সে সময় আর কোন কাজ, আর কোন কথা ভাল লাগিত না।

তাঁহার হাস্য, তাহার গল্প, তাঁহার সঙ্গীত ও পুস্তকপাঠের ভঙ্গি, সবই মৃণালিনীর বিচিত্র বলিয়া বোধ হইত। এমন ভাবে আর কেহ যেন হাসিতে পারে না, এমন মধুর ভাষায় আর কেহ যেন গল্প ও করিতে জানেনা। আর তাঁহার সঙ্গীত? এমন গান সে পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই। হারমোনিয়মে সুর দিয়া মিস্ বসু যখন গান গাহিতেন, তখন মৃণালিনীর বোধ হইত, সে যেন আর একটা অভিনব রাজ্যের স্বপ্নলোকে গিয়া পড়িয়াছে। সে সঙ্গীতে প্রেমের মান অভিমান, আদান প্রদানের কোন কথা, নিরাশ প্রণয়ের করুণ ক্রন্দন বা ব্যর্থ, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘশ্বাস নাই। সে সঙ্গীতের সুরে সুরে কেবল একটা মহা বৈরাগ্যের উদাস ভাব ঝঙ্কার তুলিয়া ফিরিত। একটা আকুল আবেদন—ব্যর্থ জীবন কর্ম্মপ্রবাহে

ঢালিয়া দিয়া সেই অনন্ত অপরিজ্ঞেয় চিররহস্যময় মহাদেবের চরণতলে শান্তিলাভের সাগ্রহ প্রার্থনা রাগিণীর ছন্দে ছন্দে নাচিয়া উঠিত। সে সঙ্গীত কি প্রাণস্পর্শী, কি অমৃতময়!

গান গাহিবার সময় গায়িকার নেত্র ঈষৎ নিমীলিত হইয়া আসিত। দীপ্ত মুখমণ্ডল করুণায়, মহিমায়, সৌন্দর্য্যে ও প্রেমে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

সঙ্গীতের শেষ তান, শেষ ঝঙ্কার লীন হইয়া গেলে, মোহাবিষ্টার মত উভয়ে ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া থাকিত। তারপর মৃণালিনী হয়ত জিজ্ঞাসা করিত, "আপনি বিবাহ করেন না কেন? বয়স ত আপনার বেশী হয় নাই। চিরকাল কি এমনই ভাবে কাটিবে?"

মিস্ বসু হাসিয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেন। হয়ত একখানা নব প্রকাশিত মাসিক পত্রের একটা ছোট গল্প পড়িয়া শুনাইতেন। কখনও বা মৃণালের শিশুটিকে কোলে তুলিয়া নাচাইতেন। বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন, "সংসার বন্ধনে যদি কোন সুখ থাকে, তবে তাহা ইহাতে। বুকের জ্বালা এমন আর কোন জিনিসে জুড়ায় না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"ধিন্ ধিন্ ধিন্, খোকন নাচে ধিন্!"

সঙ্গে সঙ্গে খোকাবাবু বিচিত্র ভঙ্গিতে দুলিয়া দুলিয়া টলিয়া টলিয়া নাচিতেছিল। নাচিতে নাচিতে কখনও ভূমিতলে পড়িয়া যাইতেছিল, আবার উঠিয়া সেই স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠের মধুর স্বরের তালে তালে নৃত্য করিতেছিল।

খোকার মা জানালার ধারে বসিয়া চৈত্রের বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল সান্ধ্য আকাশ পানে চাহিয়াছিল। তাহার শরীর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল।

দেড়বৎসরের খোকা হাসির লহর তুলিয়া কখনও মিস্ বসুর স্নেহাতুর বক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল, কখনও বা দূরে সরিয়া বসিয়া, উদার শান্ত চক্ষু দু'টি তুলিয়া সকৌতুকে চাহিয়া দেখিতেছিল। মিস্ বসু অতৃপ্ত নয়নে তাহার কচিমুখের নব নবনীততুল্য তনুর কমনীয়তা ও উচ্ছ্বসিত কলহাস্য পরম আনন্দে উপভোগ করিতেছিলেন।

শিশুর মত মায়াবী সংসারে আর কেহ নাই। বন্ধনহীন বিদ্রোহী হৃদয়কে শিশুর সরলহাস্য অলঙ্ঘ্য আবার কর্ম্ম-বন্ধনে সহজে ফিরাইয়া আনিতে পারে। শোকার্ত্তের সন্তপ্ত প্রাণের জ্বালা স্নিগ্ধ মোহস্পর্শে শীতল করিয়া দেয়।

মৃণাল কি বলিতে যাইতেছিল। এমন সময় দ্বাদশবর্ষীয় বালক মোহিতচন্দ্র ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বলিল, "দিদি, মা তোমায় ডাকছেন, শীঘ্র যাও। নরেন বাবু এসেছেন।"

দেবী।

মৃণালিনীব মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ হাস্য অধর-প্রান্তে চাপিয়া সলজ্জকণ্ঠে সে বলিল, "দিদি; আপনি একটু বসুন, আমি শুনে আসি।"

মিস্ বসু বলিলেন, "কে এসেছেন, বল্‌লে, মোহিত বাবু?"

"নরেন বাবু। আপনি তাঁকে চেনেন্ না বুঝি? তিনি আমাদের জামাই বাবু,—দিদির বর। এই দেখুন তাঁর ছবি।'

মোহিতচন্দ্র সহর্ষে হাত উঁচু করিয়া ফটোখানা তাঁহার সম্মুখে ধরিল।

"নরেন বাবু রেঙ্গুন থেকে ফটো তুলে এনেছেন। আমি একখানা কেড়ে নিয়েছি।"

কম্পিতহস্তে মিস্ বসু ফটোখানা ফিরাইয়া দিলেন। বালক সোৎসাহে বলিল, "কেমন সুন্দর ফটো, না? যাই, আমি মাকে দেখাইগে।"

বালক দৌড়িয়া চলিয়া গেল।

মিস্ বসু দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া জানালার ধারে সরিয়া গেলেন। জানালার গরাদে ধরিয়া অনিমেষ নয়নে শব্দপূর্ণ তিমিরমগ্ন আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

খোকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

খোকার ক্রন্দন শুনিয়া মৃণালিনী ফিরিয়া আসিল। পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া সে ডাকিল, "দিদি!"

মিস্ বসু ফিরিয়া চাহিলেন। মৃণাল চমকিয়া উঠিল। মিস বসুর মুখ এমন বিবর্ণ!

"আপনার অসুখ করেছে নাকি? মাকে ডাকি।"

দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া ক্লিষ্টস্বরে মিস্ বসু বলিলেন, "না, না, দাঁড়াও। মাঝে মাঝে আমার বুকে একটা বেদনা ধরে; সেই বেদনাটা ধরেছিল। এখন সেরে গেছে।"

মৃণালিনী পাখা লইয়া মিস্ বসুকে বাতাস করিতে লাগিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধাত্রী বলিলেন, "থাক্, এখন সুস্থ হয়েছি। তুমি একখানা গাড়ী আনাইয়া দাও। এখন আবার রমেশ বাবুর বাড়ী যেতে হবে।"

মৃণাল বলিল, "কাল আস্‌বেন ত?"

মিস্ বসু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তোমায় বল্‌তে ভুলে গেছি, কাল আমার গয়ায় যাবার কথা আছে। যদি যাওয়া হয়, তাহলে পনের ষোল দিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্বামী স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। পাখা করিতে করিতে মৃণালিনী বলিল, "তা তুমি যাই বলনা কেন, এ কথা আমার চিরকাল মনে থাকিবে। আমার চেয়ে তোমার কাজ বড়। যদি আমি মরে যেতুম?"

অভিমানে মৃণালের রক্তাভ ওষ্ঠদ্বয় আকুঞ্চিত হইল। প্রায় প্রত্যহই সে এমনই করিয়া স্বামীর কর্ত্তব্য-শৈথিল্যের কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়া তৃপ্তি বোধ করিত।

এ কথার উত্তর ছিল ; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ পত্নীর উচ্ছ্বাসে বাধা দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেন না। এবং চাকরীর কর্ত্তব্য বজায় রাখিতে গিয়া স্ত্রীর প্রতি খানিকটা যে অবিচার করিতে হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিত। নরেন্দ্র অন্য দিনের মত অভিযোগের তীক্ষ্ণ শরাঘাত নীরবে সহ্য করিয়া ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন।

মৃণালিনী তাহাতেও ছাড়িবার মেয়ে নয়। সে বলিল, "ও চাকরী তোমায় ছেড়ে দিতে হবে। কেন, তোমার কিসের অভাব ? শ্বশুর ঠাকুর যে টাকা রেখে গেছেন, তাতে দু' তিন শ টাকা মাইনের অমন দুটো চাকর তুমিই রাখ্‌তে পার। ছাই টাকার জন্য তুমি আর চিরকাল বিদেশে থাক্‌তে পাবে না।"

নরেন্দ্র অন্যমনে বলিলেন, "আমিও তাই ভাব্‌ছি। এক-বার সাহেবকে বলে দেখ্‌ব, যদি আমায এদেশে কোথাও বদ্‌লী করেন ভাল, নইলে মিথ্যা আর বিদেশে পড়িয়া থাকিব না।"

মৃণাল বলিল, "এখন ত আর শুধু তুমি আর আমি নই। খোকা ক্রমে বড় হইতে চলিল, তার কথাও ত ভাবিতে হয়।"

দাঁড়ে বসিয়া কাকাতুয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া মধ্যাহ্নের বিজনতা ভঙ্গ করিতেছিল। নরেন্দ্র নিমীলিত নয়নে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পত্নী স্বামীর চিন্তাগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে বাতাস করিতেছিল।

ঝি আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, মা তোমায় ডাক্‌ছেন।"

মৃণাল উঠিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া, স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া মৃণালিনী বলিল, "এখন আর ঘুমাতে হবেনা। চল, মিস্ বসুর বাড়ীতে যাই। তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।"

নরেন্দ্র সকৌতূহলে হাস্যমুখে বলিলেন, "মিস্ বসু আবার কে? তাঁকে আবার কোথা থেকে জোটালে?"

মৃণালিনী বলিল, "তোমায় বলিনাই,—আমার অসুখের সময় একজন ধাত্রী দিনরাত আমার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন? তিনি সে রকম যত্ন না করলে, ফিরে এসে তুমি আর আমায় দেখ্‌তে পেতে না। এমন মেয়ে আমি কোথাও দেখি নাই। তাঁর নাকি বড় অসুখ। তিনি একবার আমায় দেখ্‌তে চেয়েছেন।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া নরেন্দ্র বলিলেন, "এ কথা আগে বল্‌তে হয়? তোমার এখনই যাওয়া উচিত।"

মৃণালিনী বলিল, "আমি জান্‌তুম, তিনি গয়ায় গেছেন। কিন্তু তা নয়। এখানথেকে গিয়ে অবধি তাঁর অসুখ। সে আজ ষোল সতের দিনের কথা।"

স্বামী বলিলেন, "তবে আর দেরী করোনা! আমি গাড়ী ঠিক কর্‌তে বলে আসি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঝির কোলে খোকাকে দিয়া মৃণালিনী উপরে চলিয়া গেল। ভৃত্য নরেন্দ্রনাথকে মিস্ বসুর ড্রয়িংরুম দেখাইয়া দিল।

তখন কিছু বেলা আছে। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া সন্ধ্যার সুবর্ণ-সূর্য্যের শেষ রশ্মি গৃহমধ্যস্থ আস্‌বাবে পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। একটি সুদৃশ্য টেবিলের উপর খান-কয়েক সযত্ন-রক্ষিত পুস্তক, একটা দোয়াতদান, কয়েকটা কলম ও ফ্রেমে আঁটা একখানা ফটো।

নরেন্দ্র চেয়ারে বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া মুক্ত-বাতায়নপথে উদাসদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিলেন। বাহিরে রাজপথ, তাহার পার্শ্বে প্রান্তর, দূরস্থ বৃক্ষশ্রেণী ও ঘন-নীল আকাশ এক নিমিষে দেখিয়া দৃষ্টি আবার গৃহমধ্যে ফিরিয়া আসিল।

নরেন্দ্র অন্যমনে বাঁধান ফটোখানি তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। সময়ের প্রভাবে চিত্রখানি কিছু ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল, বুঝি তেমন স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। রুমালে চশমা মুছিয়া লইয়া নরেন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহার স্বভাবগম্ভীর মুখের উপর যেন মেঘ করিয়া আসিল। ধীরে ধীরে ফটোখানি রাখিয়া তিনি জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরের বাতাস আসিয়া তাঁহার

স্বেদাপ্লুত তপ্তললাটে কোমল, স্নিগ্ধ স্পর্শ ঢালিয়া দিয়া গেল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যখন শ্রান্তিবোধ হইল, তখন নরেন্দ্র ধীরে ধীরে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। একখানা বহি খুলিয়া বিক্ষিপ্ত মনটাকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় একটা নাম লেখা। অক্ষরের কালি বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বহিখানি টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শরবিদ্ধ মৃগের মত তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। তিনি কোথায় আসিয়াছেন? দিবালোকে মানুষ কি স্বপ্ন দেখে?

এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল। মৃণালিনী রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, "ওগো, শীঘ্র উপরে এস, দিদি কেমন করিতেছেন।"

দ্বারবানকে ডাক্তার আনিতে আদেশ দিয়া নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ পত্নীর সহিত উপরে উঠিয়া গেলেন।

ঘরের সকল জানালা দরজা রুদ্ধ। টেবিলের উপর একটা আলোক জ্বলিতেছে।

মৃণালিনী মিস্ বসুর নিকটে গিয়া ভীতকণ্ঠে বলিলেন, "এ কি! নিশ্বাস্ পড়্ছে না যে? শীঘ্র এ দিকে এস!"

নরেন্দ্র কিছুদিন চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, রোগীর মূর্চ্ছা হইয়াছে। পত্নীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, তুমি খানিকটা দুধ গরম করে নিয়ে এস। বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন দেখ্ছি।"

দেবী।

মৃণালিনী দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

রুগ্নাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য নরেন্দ্র আলোক শিখা আরও উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি শয্যাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি রোগীর সর্ব্বদেহে পড়িয়াছিল। তাঁহার আলুলায়িত কেশভার অযত্ন-বিক্ষিপ্ত, শোভন মুখখানি রোগের পাণ্ডুর রাগে মলিন। যৌবনের নিটোল সৌন্দর্য্যের উপর পীড়ার এইরূপ সর্ব্বগ্রাসী আক্রমণ দেখিয়া নিমেষমধ্যে নরেন্দ্রের চক্ষু পলকহীন হইল। তাঁহার মুখমণ্ডল সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। একটা প্রবল আঘাতে তাঁহার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয় যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল। নরেন্দ্র দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিলেন। একটা তীব্র আর্ত্তনাদ তাঁহার বুকের মধ্যে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

রূঢ় আলোক স্পর্শেই হউক বা স্বভাববশেই হউক, রোগীর চেতনা তখন ফিরিয়া আসিতেছিল। মিস্ বসু চক্ষু উন্মীলিত করিলেন।

একজন অপরিচিত যুবককে সেই অবস্থায় আপনার শয্যা-প্রান্তে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া প্রথমতঃ তিনি চকিত হইলেন। পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি! তুমি!"

সমুদয় হৃদয় মন্থন করিয়া সেই বেদনারুদ্ধ স্বর যেন কক্ষ-মধ্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

দুই জানু নত করিয়া নরেন্দ্র রোগীর শীর্ণ, শীতল বাম-হস্তখানি তাঁহার অগ্নিময় দুইহস্তে চাপিয়া ধরিয়া উন্মত্তের

মত বলিলেন, "অমিয়া, অমিয়া, আমার অপরাধের মার্জ্জনা নাই। তোমার সহিত যে নৃশংস ব্যবহার করিয়াছি, সংসারের কোন শাস্তিই তাহার উপযুক্ত নহে।" বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত আবেগে নরেন্দ্রের বাক্য রুদ্ধ হইল। ক্ষীণকণ্ঠে মিস্ বসু বলিলেন, "তুমি অপরাধী, এ কথা আমি কখনও মনে করি নাই।"

ধীরে ধীরে মিস্ বসু নরেন্দ্রের হস্তপাশ হইতে আপনার হস্ত বিমুক্ত করিয়া লইলেন।

এমন সময় মৃণালিনী দুগ্ধ পাত্র লইয়া ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

নরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন; উত্তেজিত স্বরে পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এস, আমার জীবনের যে গূঢ় মসীলিপ্ত অংশ তোমার কাছে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লও। শুন মৃণাল, ইনি তোমার সপত্নী। বোধহয় শুনিয়া থাকিবে, পাঠ্যাবস্থায় আমার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা ছিল না। সেই সময় পিতার অজ্ঞাতসারে ইঁহাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিয়াছিলাম। অতুল সম্পত্তির লোভে পড়িয়া, বন্ধুদের পরামর্শে আমার দুর্ব্বল মন টলিয়া গেল। সম্পত্তি হারাইবার ভয়ে, ও পিতার অভিপ্রায় মত এক ধর্ম্মপত্নীর বিনিময়ে আর এক ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ করিলাম। কিন্তু মনের শান্তি জন্মের মত ঘুচিয়া গেল। তাই দেশ বিদেশে কক্ষচ্যুত উল্কার মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। আর আমার

ক্ষমা চাহিবার সাহস হইতেছে না। তুমি উঁহার চরণ ধরিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া লও।"

তীব্র বেদনাভরে মৃণালিনীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। কিন্তু সাধ্বী হৃদয়ের সমস্ত বল একত্র করিয়া সে আঘাত সহ্য করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অকম্পিত পদে শয্যাপ্রান্তে নতজানু হইয়া রুগ্নার চরণযুগল মাথায় তুলিয়া মৃণালিনী বলিল, "দিদি, তুমি একবার আমায় মরণের মুখ হইতে কাড়িয়া আনিয়াছ, এখন বাঁচাও ক্ষমা কর, আশীর্ব্বাদ কর।"

ধাত্রীর স্তিমিত নয়নপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু উদ্গত হইল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে মিস্ বসু বলিলেন, "তিনি অবশ্য ক্ষমা করিবেন। আমি প্রতিদিন তাঁহার কাছে এই প্রার্থনাই করিয়াছি। তোমরা সুখী হও। দে বোন্, খোকাকে এখন একবার আমার বুকে আনিয়া দে।"

মৃণালিনী কাঁদিয়া উঠিল।

* * * * * *

মুঙ্গেরে গঙ্গাতরঙ্গমুখর শান্ত উপবন-প্রান্তে এক মর্ম্মরময় সমাধিস্তম্ভ। ঘনীভূত জ্যোৎস্নার ন্যায় শুভ্র ও সুন্দর। তাহার শীর্ষদেশে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল ওঁকার মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সমাধিলিপির শিখরদেশে শরবিদ্ধহৃদয় কপোতের ছবি। তাহার নীচে কমল ও কুমুদমাল্যের বেষ্টনমধ্যে লিখিত,

"টুটিয়া গিয়াছে তব বিষাদ-বন্ধন
সায়াহ্ন পদ্মের শীর্ণ দলরাজি সম ;
পবিত্র জীবন সিন্ধু করিয়া মন্থন
পেয়েছ কি প্রেমরত্ন নিত্য নিরুপম !
মৃত্যু মাঝে লভিয়াছ আনন্দ অমৃত,—
বিশ্বপ্রাণে শান্তিমগ্ন, আপনা বিস্মৃত।"

বসন্তের পূর্ণিমা রজনীতে জ্যোৎস্নালোকে যখন চারিদিক হাসিয়া উঠিত, পুষ্পগন্ধে বাতাস যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িত, এবং একটা উদার অনবদ্য মঙ্গল মধুর মহিমশ্রীতে চরাচর পরিপূর্ণ হইত, সেই সময় প্রতিবৎসর তিনজন তীর্থযাত্রী এই সমাধিস্তম্ভের পাদমূলে ভক্তিভরে অবনত হইত। অশ্রু-শিশির-সিক্ত পুষ্পভারে ও পদ্মমুকুটে সজ্জিত মর্ম্মর সমাধি চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

ব্যাধি ও প্রতিষেধক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পিতা বৃদ্ধ ও নেহাৎ সেকেলে মানুষ; সুতরাং একমাত্র পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন হেমচন্দ্র। দেশের স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া লইয়া পুত্র কলিকাতায় আসিয়া হিন্দুস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে নাম লিখাইল,—হেমকান্তি রায়।

কোনও আত্মীয় বা বন্ধু, তাহার এই আকস্মিক নাম পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হেমকান্তির ওষ্ঠপ্রান্তে ওজন করা হাসিটুকু দেখা দিত। স্বভাবসিদ্ধ নম্রভাবে সে বলিত যে, তাহার পিতা পৌরাণিক যুগের মানুষ, কাজেই তাঁহার পছন্দও সেইরূপ; কিন্তু পুত্র ত আর মান্ধাতার আমলের নয় যে, পুরাতন, জীর্ণ নামটির বোঝা বহিয়া বেড়াইবে? "চন্দ্রে"র গুরুভার বহন করা তাহার ক্ষুদ্র শক্তির অতীত।

অল্পকালের মধ্যেই ক্লাসের মধ্যে হেমকান্তি বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিল। তাহার চাল চলন, কথার ভঙ্গি, বেশভূষার পারিপাট্য ও বৈচিত্র্য, সকল বিষয়েই সে সহপাঠী-দিগের হাস্য ও কৌতুকের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিল।

কবিতা-রচনার অভ্যাস না থাকিলেও হেমকান্তি অসাধারণ পটুতার সহিত কবিতা নকল ও আবৃত্তি করিতে পারিত। তাহার অ্যাল্‌জ্যাব্‌রার খাতার মধ্যে, "তুমি কেন মূর্ত্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান ধারণার", জিওমেট্রীর প্রস্তাবনার শীর্ষভাগে "শৈবলিনী—সৈ," ইংরাজী কোর্শের নোটবুকে "ঐ বুঝি বাঁশী বাজে" প্রভৃতি দেখা যাইত।

তাহার মস্তকের দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাজি সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে হেমকান্তি বিজ্ঞের ন্যায় বলিত, "চুল রাখার উপকারিতা সামান্য নহে। দীর্ঘ কেশ বড় কবির লক্ষণ। কবিতার ছন্দ কুঞ্চিত কেশদামের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া মস্তিষ্কে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপর সহসা লেখনীসাহায্যে বন্যার ন্যায় কাগজের অঙ্গে প্রবাহিত হয়।"

পৃথিবীর সকল সংবাদই হেমকান্তির নখাগ্রে ছিল। আজ এত তোপ পড়িল কেন, বড়লাট কাল কোন্ রাজার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের মধ্যে কোন্ কোন্ জমীদার গবর্ণমেণ্টের খয়ের খাঁ, কোন্ কবি কি কাব্য লিখিতেছেন, অমুক লেখকের বাড়ী কোথায়, কি করেন, এবং কয়টি সন্তান; কাহার পত্নী সুন্দরী, এ সমস্ত সংবাদ হেমকান্তি মুখস্থ 'হিষ্ট্রি'র মত অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিত।

হেমকান্তির আর একটি মহৎগুণ ছিল, কেহ তাহাকে রাগাইতে পারিত না। বিদ্রূপের বাণ যতই তীব্র ও তীক্ষ্ণ হউক না কেন, তাহার সহিষ্ণুতারূপ দুর্ভেদ্য, দৃঢ় বর্ম্মে আহত

হইয়া সমস্ত বিমুখ হইয়া যাইত। মহাদেবের ন্যায় নির্ব্বিকার ও নিশ্চলভাবে সে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের উপহাসরাশি নীরবে গ্রহণ ও জীর্ণ করিত।

কোনও দিন স্কুলে আসিয়া সে সহপাঠীদিগকে জানাইত যে, মুক্তাগাছার মহারাজ তাহাকে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রমাণ-স্বরূপ সেই সঙ্গে সে একখানি সংগৃহীত সুরঞ্জিত সোনালী ছাপার চিঠী সহপাঠীদিগের সম্মুখে ধরিত। কখনও গল্প করিত যে, রাখীপূর্ণিমা উপলক্ষে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে সাহিত্য-সেবীদিগের মাসিক সম্মিলন হইয়াছিল; বড় বড় কবি ও ঔপন্যাসিকের সহিত সেখানে তাহার আলাপ হইয়া গিয়াছে।

আর কিছু না হউক, দেড়টার ছুটীটা সহপাঠীরা বিলক্ষণ আমোদে কাটাইয়া দিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সহপাঠিগণ কলেজের পড়া পড়িতে লাগিল। হেমকান্তি 'এক্‌স্‌-ষ্টুডেণ্ট' স্বরূপ সেণ্ট জেভিয়র কলেজে নাম লিখাইল। পরীক্ষা না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হেমকান্তি মধুর হাস্যের সহিত উত্তর করিত, "বৃথা পরীক্ষার জন্য শক্তির অপচয় করাটা সঙ্গত নহে। বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের উপাধিতে অঙ্গবিশেষ বর্দ্ধিত হয় না। আজ কাল অনেক বনিয়াদী ও সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা পরীক্ষা দেওয়াটা কেবল অকারণ জীবনী-শক্তির হানিকর বলিয়া মনে করেন," ইত্যাদি।

গ্রীষ্মাবকাশে দেশে ফিরিলে হেমকান্তির পিতা বলিলেন, "বাপু বিদ্যা তোমার যথেষ্ট হইয়াছে। আমাদের বংশে এত লেখা পড়া কেহ শিখে নাই; এখন জমীদারী কাজকর্ম্ম বুঝিয়া লও। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর পারি না।"

মাতা বলিলেন, "বাবা রাঙ্গা দেখে বউ ঘরে নিয়ে আসি। আর কতকাল সন্ন্যাসীর মত থাক্‌বি? তোকে সংসারী দেখে আমরা নিশ্চিন্ত হই।"

উত্তরে শ্রীমান হেমকান্তি পিতাকে জানাইল যে, জমীদারীর কাজকর্ম্ম দেখিবার জন্য একজন নাযেব রাখিলেই চলিবে। বিষয় কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে পড়িলে তাহার কাব্য সাহিত্য আলোচনার বিশেষ ক্ষতি ত হইবেই, তা ছাড়া বর্ত্তমান 'ফ্যাশনের' অনুরোধে সে ঐ সকল তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া নাড়া চাড়া করিতে নিতান্ত অসমর্থ।

মাতাকে সংক্ষেপে বলিল, "হাম্ সাদি নেহি করেঙ্গে।"

বন্ধুবান্ধবেরা অনুরোধ করিলে সে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিত, "সর্ব্বনাশ! বিবাহ জিনিসটা কি যেমন তেমন ব্যাপার! যাঁকে তাঁকে কি হৃদয়টা বিলাইয়া দেওয়া যায়? বিস্তর বিবেচনা ও বহু অনুসন্ধানের পর তবে একজনকে

জীবন-সঙ্গিনী করিতে হইবে। বিশেষতঃ, যাহাকে হৃদয় দান করিব, হৃদয়ের মর্য্যাদা বুঝিবার বয়সটা তাহার হওয়া চাই।"

কিছুদিনের মধ্যে হেমকান্তির মতাবলম্বী বন্ধুগণ বিবাহরূপ স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া জীবনকে ধন্য ও সার্থক করিল। হেমকান্তি যাঁহাদিগকে আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিত, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে এক একখানি ইন্দ্রজালভরা বিচিত্র অঞ্চলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সুতরাং একদা প্রাতঃকালে, ট্রেণে হেমকান্তি গৃহে ফিরিল। পরদিন গ্রামের লোক সবিস্ময়ে দেখিল, শ্রীমান্ হেমকান্তি মহা গম্ভীরভাবে ও আগ্রহ সহকারে জমীদারী কাগজপত্র দেখিতেছে।

সে পিতাকে বলিল, কাজকর্ম্ম ভাল করিয়া শিক্ষা করিবার জন্য সে কৃষ্ণগঞ্জের কাছারীতে যাইবে। লোকদ্বারা মাতাকে আভাস দিল, বিবাহ করিতে তাহার কোন আপত্তি নাই। তবে মেয়েটি ডানা কাটা অপ্সরা না হইলেও সুন্দরী হওয়া চাই।

তখন দেশের লোক ও বন্ধুবান্ধব সকলেই ভাবিল, "স্বভাবকবি"র মত বুঝি এইবার ফিরিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈশাখের অপরাহ্ন। আকাশে বারি-বিদ্যুৎ-ব্যাকুল মেঘরাশি ছুটাছুটি করিতেছিল। পবনের বেগও প্রখর।

শরৎচন্দ্র স্কুলের ছুটী দিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিতেছিলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "মাষ্টার! মাষ্টার!"

শরৎচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন, খাকী ড্রিলের 'মিলিটারী' পোষাকে মূর্ত্তিমান হেমকান্তি!

"তুমি অসময়ে কোথা থেকে কবিবর?"

কস্‌মেটিক্ দেওয়া ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফরাজির নিম্নপ্রান্ত হইতে হেমকান্তির পরিমিত হাসিটুকু দেখা গেল। বন্ধুর পাণিপীড়ন করিয়া সে বলিল, "সম্প্রতি কলিকাতা হইতে আসিতেছি, তোমার সহিত বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

ছাত্রজীবন-অবসানের পর আজ পাঁচ বৎসরের মধ্যে একখানি পত্র দ্বারাও যে হেমকান্তি বন্ধুর পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করা আবশ্যক মনে করে নাই, কলিকাতা হইতে সুদূর পল্লীপ্রান্তে এহেন দরিদ্র বন্ধুর নিকট হেমকান্তির কি প্রয়োজন ভাবিয়া শরৎচন্দ্র কিছু কৌতূহলী হইয়া পড়িলেন।

বৃষ্টি আগত দেখিয়া শরৎচন্দ্র বন্ধুসহ বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্য আলোক জ্বালিয়া দিল। ধূমপান করিতে

করিতে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন বলদেখি ব্যাপারখানা কি?"

হেমকান্তি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল।

বন্ধু বলিলেন, "অজ্ঞাতবাস করিয়া ভাবী গৃহলক্ষ্মীর সন্ধান করিতে চাও, সে ত সুখের কথা। আমিও যথাসাধ্য তোমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু ভাই! তোমার সহিত ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে বেড়াইবার অবকাশ আমার আদৌ নাই। ঐটি মাপ করিতে হইবে।"

হেমকান্তি বলিল, "আচ্ছা, তবে গোটা কয়েক ভাল গোছের সন্ধান বলিয়া দাও। আর তোমার একটা ঘোড়া আছে শুনিলাম, সেটা আমাকে দিন কয়েকের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

হেমকান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল।

শরৎচন্দ্র সবিস্ময়ে বলিলেন, "উঠিলে যে?! তুমি এখনই যেতে চাও নাকি? বল কি? আকাশে যে রকম মেঘ হয়েছে, শীঘ্রই ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আসবে। আজ রাত্রিটা দরিদ্রের কুটীরে থাকিয়া যাও। তোমার যে একরাত্রির বিলম্বও সহ্য হয় না?"

বন্ধুর পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া হেমকান্তি সহাস্যে বলিল, "তুমি বুঝলে না ভাই, নায়িকার সন্ধানের এই ত প্রকৃত অবসর। আকাশে বিদ্যুতের দীপ্তি, বজ্রের গর্জ্জন, পৃথিবীর তপ্তবক্ষে অশ্রান্ত বারিধারা, তিমিরময় প্রকৃতির মুক্ত অঞ্চল

লইয়া মত্তপবনের লীলা! এর চেয়ে শুভ সুন্দর মুহূর্ত্ত আর কি পাইব? তুমি ত অনেক কাব্য পড়িয়াছ, 'দুর্গেশনন্দিনী'ও দেখিয়াছ, সুতরাং তোমাকে অধিক বলা বাহুল্য।"

উচ্ছ্বসিত হাস্য অতি কষ্টে দমন করিয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন, "বাঃ! জগৎসিংহ! বেশ! প্রেমদেবতার কল্যাণে এখন তিলোত্তমা লাভ হইলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রাবণের মেঘ-মেদুর আকাশ কবি জনের চির প্রিয়। চারি দিকে অবিশ্রান্ত বারিধারা। প্রকৃতি রাগিণীময়ী, সঙ্গীত-স্বপ্নময়ী! সুতরাং হেমকান্তি বাছিয়া বাছিয়া শ্রাবণ মাসটাই বিবাহের উপযুক্ত সময় বলিয়া মনোনীত করিয়াছিল।

বন্ধু হরেন্দ্র বলিল, "যাহা হউক, কবি, এত দেখিয়া শুনিয়া শেষে একটি নয় বৎসরের বালিকাকে পছন্দ করিলে? তুমি ত বরাবর বালিকাপত্নী-গ্রহণের বিরোধী ছিলে!"

ঈষৎ হাসিয়া হেমকান্তি বলিল, "মতের কি পরিবর্ত্তন হয় না? বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, যাহার মতের পরিবর্ত্তন হয় না, হয় সে মুক্ত-পুরুষ, নয় ত ঘোর ভণ্ড। 'অথরিটি' আছে।"

দেবেন বলিল, "তা ত বটেই! বিশেষতঃ যে সকল ক্ষেত্রে দুই এক জন বড় লোকের সহিত আত্মীয়তা হইবার সম্ভাবনা থাকে, প্রভৃতি। কিন্তু ভায়া, ওষ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত শ্মশ্রুরাজির প্রতি এত অনুগ্রহ হইল কেন? ইহারও কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে নাকি? 'অথরিটী' এ ক্ষেত্রে কি বলেন?"

"তোমরা বুঝলে না। বর্ব্বর লোমশ পশুর ন্যায় বীভৎস বেশে কোমলাঙ্গী রমণীদের সমাজে যাওয়াটা ঘোরতর অসভ্যতা। হয়ত তাঁহারা আতঙ্কে ডরাইয়া উঠিতে পারেন।"

গিরীন্দ্র কথাটা লুফিয়া বলিল, "কবি বলেছে মিথ্যা নয়! কিন্তু মস্তকের কেশ ও ভ্রূযুগল কি অপরাধ করিয়াছে ভাই? উহাদের প্রতিও সমান বিচার করা তোমার উচিত ছিল; বিশেষতঃ তাহাতে সামঞ্জস্য রক্ষা পাইত। ললনাকুলও তজ্জন্য তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকিতেন।

সতীশচন্দ্র সলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এবং বাসরঘরের সুন্দরীগণ একটা নির্দ্দোষ আমোদ ও কৌতুকের জীব অবলোকন করিয়া ধন্য হইতেন। তাঁহাদের বাসরজাগরণও সার্থক হইত।"

তখন বন্ধুমণ্ডলে একটা হাসির ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

হেমকান্তি টলিল না। প্রফুল্ল মনে মেঘ-মূর্চ্ছিত সন্ধ্যার আকাশে চাহিয়া অবশেষে সে একবার নেত্রযুগল নিমীলিত

করিল। আজ কি আনন্দ, কি তৃপ্তি! সমগ্র প্রকৃতি আজ তাহাকে বরণ করিবার জন্য কি বিচিত্র আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে!

অন্তঃপুরে সন্ধ্যার মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। আর দেরী নাই। যাত্রার সময় উপস্থিত। হেমকান্তি রাজবেশ ধারণের জন্য কক্ষান্তরে গমন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হেমকান্তির বরাবর একটা ধারণা ছিল, উপভোগেই জীবনের চরম সার্থকতা। বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট সে প্রায় আক্ষেপ করিয়া বলিত যে, বাঙ্গালী এখনও জীবনটাকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে শিখে নাই। বিবাহের পর সে সকলকে দেখাইবে, উপভোগদ্বারা জীবনকে কেমন সার্থক ও সুন্দর করিয়া তোলা যায়।

পূর্ব্ব সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে হেমকান্তি বিবাহের অল্পকাল পরেই পত্নীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিল। পল্লীগ্রামে সুশিক্ষার নানারূপ প্রতিবন্ধক। ভাল বিদ্যালয় নাই, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীরও সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং সে পত্নীকে পিত্রালয় হইতে আনাইয়া ভায়রাভাই শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রসুন্দরের কলিকাতার প্রাসাদে রাখিয়া দিল। সেখানে পত্নীর শিক্ষার

বিশেষ সুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর আশ্রয়ে থাকিলে বালিকা আত্মীয়ের অভাব অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। তার পর সূক্ষ্ম শিল্প, সঙ্গীত ও ইংরাজী শিক্ষারও কোনরূপ প্রতিবন্ধক হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

পিতামাতা পুত্রের এই অদ্ভুত কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে হেমকান্তি তাঁহাদিগকে লিখিয়া পাঠাইল যে, বধূ এখনও নাবালিকা। সংসারের কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিবার উপযুক্ত বয়স ও শিক্ষা তাহার এখনও হয় নাই। সকলকে সুখী করাই হেমকান্তির একান্ত বাসনা। বধূ যাহাতে গুরুজনদিগের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে, সংসার মরুভূমিতে শীতল বারিধারা ঢালিয়া দিতে পারে, সেইরূপ সুশিক্ষা দিবার জন্যই সে এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছে।

পিতামাতা পুত্রের চরিত্র অবগত ছিলেন, সুতরাং এ বিষয়ে অধিক প্রতিবাদে ফল লাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

সকলেই ভাবিয়াছিল, এবার শ্রীমান হেমকান্তি স্বয়ং ধনবান্ ভায়রার সুখময় আতিথ্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু হেমকান্তি তখনও কলিকাতার ছাত্রাবাসের পরিচিত নির্জ্জন কক্ষটি ত্যাগ করিল না।

সপ্তাহের মধ্যে তিনবার শ্যালীগৃহে হেমকান্তির নিমন্ত্রণ হইত। কিন্তু সে মাসের মধ্যে একবার কি দুইবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইত। সেখানে পত্নীর সহিত দেখা হইত, কিন্তু

তাহার সহিত রীতিমত আলাপ পরিচয় করিবার প্রলোভন হেমকান্তি অসামান্য যত্নের সহিত দমন করিত।

তাহার উপবাসী, ক্ষুধিত হৃদয় শ্যালী গৃহের অপর্য্যাপ্ত রাজভোগ ও অনায়াসলভ্য আরামলাভের জন্য মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই, কিন্তু সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়েই সে এই প্রকার অযাচিত সেবা ও আদর লাভের সুযোগ ত্যাগ করিত।

সে বুঝিয়াছিল, বালিকা-হৃদয়ে জোর করিয়া অধিকার বিস্তার করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা এবং আদৌ কবিজনোচিত নহে। তাহাতে পবিত্র, স্বর্গীয় প্রণয়ের প্রতি ঘোরতর অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে "লভ্" বলে, বাঙ্গালীর মেয়েরা তাহার মর্ম্ম অবগত নহে। জানিবার অবসরই বা তাহাদের কোথায়? যৌবনের মলয় পবনে হৃদয়কমল বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই বালিকার কুন্দশুভ্র কোমল অন্তরতলে যে মূর্ত্তির ছায়া পতিত হয়, সংস্কার অথবা অভ্যাসবশে বালিকা তাহাকে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে শিখে। কিন্তু তাহাতে প্রণয় বা "লভের" কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস নাই। বালিকার স্নিগ্ধ ভালবাসায় তৃপ্তি জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয় তাহাতে পুলকিত হয় না, হৃদয়-তট-প্রণয় স্রোতে প্লাবিত হইয়া যায় না। দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিসাধন বালিকার প্রেমে অসম্ভব। সুতরাং হেমকান্তি বালিকা-পত্নীর হৃদয়ে অকালে স্বামীর প্রভাব ও অধিকার বিস্তার করিতে সম্মত ছিল না।

সে স্থির করিয়াছিল, আপাততঃ পত্নীর সংসর্গ হইতে সে দূরে দূরেই থাকিবে। সে যে স্বামী, পত্নীকে একথা পূর্ণমাত্রায় বুঝিতে দিবার অবকাশ এখন সে কোন ক্রমেই দিবে না। অবশ্য মাঝে মাঝে বালিকার সম্মুখে সে সুন্দর মূর্ত্তিখানি লইয়া আবির্ভূত হইবে বটে ; কিন্তু পতির কোন প্রকার দাবী লইয়া নহে—দীপ্ত বিদ্যুৎ শিখার ন্যায় পত্নীর নব উন্মেষিত হৃদয়গগনে এক একটি রেখা রাখিয়া যাইবে মাত্র। সেই ক্ষণিক আলোক-দীপ্তি বালিকার হৃদয় রাজ্যকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে। মোহমুগ্ধ বালিকা, সেই তীব্র আলোক-দীপ্তির সাহায্যে তাহার আরাধ্য দেবতার মোহন-মূর্ত্তির প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতে থাকিবে। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত বালিকার মন স্বামীর চিন্তায়, তাহাকে লাভ করিবার বাসনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। তারপর যখন যৌবন মুকুল পত্নীর দেহলতাকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে, প্রণয়-বন্যার উদ্দাম কলোচ্ছ্বাসে হৃদয়তট পরিপ্লাবিত হইয়া যাইবে, এবং যখন মোহময়ী কল্পনা নব যুবতীর মনের সকল অংশে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে থাকিবে, তখন সে স্বামীর সমস্ত অধিকার সহ গৃহলক্ষ্মীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে। শিক্ষায়, দীক্ষায় নারীজীবন তখন যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে হেমকান্তির আক্ষেপ করিবার আর কিছুই থাকিবে না। তখন সত্য সত্যই সে ধন্য হইবে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নরাজ্যটা যখন যথারূপে হেমকান্তির দখলে আসিল, তখন তাহার পিতামাতা উভয়েই চিত্রগুপ্তের কাছে হিসাব নিকাশ দাখিল করিয়াছিলেন নিতান্ত অনাবশ্যক ভার বোঝা স্কন্ধ হইতে নামিয়া যাওয়াতে হেমকান্তিও পরম নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

শিক্ষিতা নবীনা সুন্দরীর সাহচর্য্য অবাধে ও প্রচুরপরিমাণে উপভোগের আকাঙ্ক্ষায় তখন হেমকান্তি চন্দন নগরে একটি নিকুঞ্জ ভবন ক্রয় করিল। গঙ্গাতীরে বেলাভূমির উপরেই সুদৃশ্য পুষ্পকানন। পল্লব-বহুল নিবিড় বৃক্ষবীথির আবরণ ভেদ করিয়া কৌতহলী মানব চক্ষু সহসা তাহাদিগের নির্জ্জন প্রেম-চর্চ্চার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিত না। কুসুম পুঞ্জের ঘন সুগন্ধে কাননতল আমোদিত হইয়া উঠিত। ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাস পাষাণ সোপানে প্রতিহত হইয়া একটা মধুর রাগিণী ও বিচিত্র ছন্দের সৃষ্টি করিত। আত্মহারা হেমকান্তি পত্নীর সৌন্দর্য্যসুধা তৃষিত নেত্রে পান করিতে করিতে বহু মধুর সন্ধ্যা ও চন্দ্রালোকিত রজনী সেই সোপানোপরি অতিবাহিত করিত।

কিন্তু এরূপ অবসর ক্রমশঃ হেমকান্তির অদৃষ্টে দুর্লভ হইয়া উঠিতে লাগিল। "ভায়রা" শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রসুন্দরের দৌলতে ও যত্নে সে বহু রাজা, মহারাজ, হাকিম ও উকীলের সহিত পরিচিত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের সান্ধ্যভোজ, বাগানপার্টি ও ষ্টীমার

ভ্রমণরূপ নিত্য নূতন আমোদে যোগদান করিবার পর তাহার অবাধ প্রেম-চর্চ্চার অবসর অতি অল্পই ঘটিত।

আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে নরেন্দ্রসুন্দর ও তাঁহার পত্নীকেই হেমকান্তি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিত। তাহার উদার ব্যবহার ও ঐকান্তিক আত্মীয়তায় মুগ্ধ হইয়া নরেন্দ্র সুন্দর অনেক সময় অযাচিত ভাবে হেমকান্তির অনুপস্থিতি কালেও তাহার কুঞ্জভবন পবিত্র করিয়া যাইতেন। সেটা তাহার পরম শ্লাঘার বিষয় ছিল। সম্ভ্রান্ত মহলে পরিচিত হইবার জন্য হেমকান্তি নরেন্দ্র সুন্দরের নিকট চিরঋণী থাকিবে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তখনও ভোর হইতে কিছু বিলম্ব আছে। হেমকান্তি. 'এলার্ম' দেওয়া ঘড়ীর শব্দে জাগিয়া উঠিল নিদ্রিতা পত্নীকে তুলিয়া বলিল, "আজ মিঃ রায় একটা ষ্টীমার-পার্টী দিবেন। ৭টার সময় ষ্টীমার ছাড়িবে। ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত বেড়াইতে যাইব। আজ রায়-পত্নী স্বহস্তে আমাদিগকে আহার্য্য পরিবেশন করিবেন। আমি এখনই যাইতেছি।"

পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া পত্নী বলিল, "কখন ফিরিবে?"

"বোধ হয় কাল সন্ধ্যায়, কিংবা পরশু মধ্যাহ্নে।"

"এত দেরী হবে? নরেন্দ্র বাবুও যাবেন নাকি?"

ব্যাধি ও প্রতিষেধক

হেমকান্তি বেশ-বিন্যাসে ব্যস্ত বলিয়া পত্নীর কৌতুকালোক-দীপ্ত দৃষ্টি লক্ষ্য করিল না। সে বলিল, "নরেন্দ্র বাবুর শরীর অসুস্থ, তিনি যাইতে পারিবেন না।"

মৃদু হাসিয়া পত্নী বলিল, "তোমরা পুরুষ মানুষ বেশ আছ। ইচ্ছা হইলেই যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে পার। যত দোষ আমাদের।"

সোহাগভরে পত্নীর গণ্ডদেশ অঙ্গুলিদ্বারা নিপীড়িত করিয়া হেমকান্তি বলিল, "তুমি যাবে? চলনা, আমার সঙ্গে ষ্টিমারে বেড়াইয়া আসিবে?"

"মরণ আর কি! রাজ্যের পুরুষ-মানুষের সাম্নে যেতে গেলাম কেন? আমার কি আর বেড়াইতে যাইবার জায়গা নাই?"

সিল্কের চাদর খানি স্কন্ধের উপর পরিপাটী রূপে রাখিয়া হেমকান্তি বলিল, "তা হ'লে, এখন আসি! বেলা হয়ে গেল।"

খোলা জানালা দিয়া উষার স্নিগ্ধ বাতাস ফুলের গন্ধ বহিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল।

বেলা বিস্রস্ত কেশভার আবদ্ধ করিতে করিতে সংক্ষেপে বলিল, "এস।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দুইদিন পরে অপরাহ্নে উৎফুল্লচিত্তে হেমকান্তি বাড়ী ফিরিয়া আসিল। শ্রীমতী রায়ের বিনয়নম্র ব্যবহার, অকুণ্ঠিত আলাপ, পরিবেশনকালে সুন্দর, সুডৌল হস্তের অলঙ্কার নিক্কণ ও অম্লান পদ্মের মত মধুর মুখশ্রী হেমকান্তির অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই হেমকান্তির চমক ভাঙ্গিল। বেলারাণী তখনও বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসে নাই। হেমকান্তি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। পত্নী সেখানেও নাই! সে ভাবিল, বেলা হয়ত এখনও চাঁমেলী-কুঞ্জে বসিয়া আছে।

বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের জন্য হেমকান্তি টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইল। সহসা একখানি পত্র তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। ক্ষিপ্রহস্তে পত্রখানি খুলিয়া সে পাঠ করিল। বেশী কিছু লেখা ছিল না, তথাপি তাহার মুখমণ্ডল এত বিবর্ণ হইয়া গেল কেন?

পত্রে লেখা ছিল,—"তোমার অপেক্ষায় থাকিতে পারিলাম না। দিদি, মধুপুরে আছেন, বোধ হয়, জান। তাঁর শরীর অসুস্থ শুনিলাম। আমারও মনটা বড় খারাপ। একা একা আর ভাল লাগিতেছে না। নরেন্দ্র বাবু আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আজই আমি মধুপুরে চলিলাম। তোমার কষ্ট হইবে বলিয়া, চাকর চাকরাণী কাহাকেও সঙ্গে লইলাম না।"

ব্যাধি ও প্রতিষেধক।

বাঃ! এ কি! পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডলকে পরিত্যাগ করিয়া কি সম্প্রতি হেমকান্তির চারিপার্শ্বে আবর্ত্তিত হইবার অধিকার পাইয়াছে? এতকাল পরে অচেতন ঘরগুলারও পা বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে নাকি? হেমকান্তি! হেমকান্তি! তুমি ত কখনও কারণ সুরাপান অভ্যাস কর নাই, কিন্তু তোমার সমস্ত শরীর এমন টলিতেছে কেন?

মাতালের ন্যায় স্খলিত-চরণে হেমকান্তি একখানি আসনে বসিয়া পড়িল।

ভগিনীপতির সহিত দিদিকে দেখিতে যাওয়া এমন কি মারাত্মক অপরাধ?—কিছু না। কিন্তু নরেন্দ্রসুন্দর শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ষ্টীমার পার্টিতে যাইতে পারিলেন না, অথচ সেই দিনই মধুপুরে বেড়াইতে গেলেন?—সেটা আর এমন কি বিচিত্র ব্যাপার! বিশেষতঃ পত্নী যখন সেখানে পীড়িত! কিন্তু বেলা, একা গেল কেন? একটি পরিচারিকা সঙ্গে গেলে হেমকান্তির কি এমন বিশেষ অসুবিধা হইত? তবে কি কোন—

বৃশ্চিক-দষ্টের ন্যায় তীব্রবেগে উত্থিত হইয়া হেমকান্তি ক্ষিপ্রহস্তে দেরাজ খুলিয়া ফেলিল। কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াই সে উল্কার ন্যায় বেগে কক্ষত্যাগ করিল।

প্রভুর আদেশে কোচ্‌ম্যান্ গাড়ী জুতিয়া আনিল।

পাচক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রে আপনার জন্য কি লুচি ভাজিব?"

উত্তরে বেচারা ব্রাহ্মণ প্রভুর কর-ধৃত যষ্টির কোমল স্পর্শ অনুভব করিল। বাবুর এরূপ ব্যবহার কেহ কখনও দেখে নাই।

গাড়ী হেমকান্তিকে বহন করিয়া নক্ষত্রবেগে ব্যাণ্ডেল জংশন অভিমুখে ছুটিল। বোম্বাই মেল তাহাকে ধরিতেই হইবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

গাড়ী যখন মধুপুরে পৌঁছিল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে! পথ জনশূন্য। উপায়ান্তর না দেখিয়া হেমকান্তি 'ওয়েটিংরুমে' অপেক্ষা করাই সঙ্গত মনে করিল। সমস্ত প্রকৃতি আজ তাহার প্রতি বাম! সে যদি মধুপুরের বাড়ীটাও চিনিত!

উৎকণ্ঠা-কম্পিত হৃদয়ে, অবসন্নভাবে হেমকান্তি একখানি আসনে বসিয়া পড়িল। ঘড়ীর কাঁটাবও কি আজ পক্ষাঘাত হইয়াছে?

বৃষ্টির সঙ্গে ক্রমশঃ ঝটিকার বেগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।—হেমকান্তি প্রমাদ গণিল।

মানসিক দুশ্চিন্তা চরম সীমায় উঠিলে ঘোরতর অবসাদ মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে। মানুষ তখন তন্দ্রামগ্ন হয়। রাত্রিশেষে হেমকান্তির মস্তক ঢলিয়া পড়িল।

তাহার নিদ্রা যখন ভঙ্গ হইল, তখন প্রভাতালোকে ওয়েটিং-রুম্ উদ্ভাসিত হইয়াছে। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। হেমকান্তি ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে সাতটা বাজে।

দ্রুতপদে সে বাহিরে আসিল। প্লাটফরমে একখানা ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ দাঁড়াইয়াছিল। তখনই গাড়ী ছাড়িবে। শেষ ঘণ্টা টং টং করিয়া বাজিয়া উঠিল।

গাড়ীর দিকে চাহিবামাত্র হেমকান্তির প্রাণবায়ু মুখের কাছে যেন ছুটিয়া আসিল। একখানি প্রথম শ্রেণীর কক্ষে তাহারই জীবনসঙ্গিনী বেলা ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রসুন্দর! তাহারা কেহই হেমকান্তিকে লক্ষ্য করে নাই।

মুহূর্ত্তমাত্র হেমকান্তি মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

উন্মত্তের ন্যায় সে গাড়ীর অভিমুখে দৌড়িল। বলপূর্ব্বক সে যেমন গাড়ীর দরজা খুলিতে যাইবে, অমনই রেলওয়ে পুলিশ তাহার গতিরোধ করিল।

গোলযোগে গাড়ীর আরোহীদিগের দৃষ্টি হেমকান্তির উপর পতিত হইল।

গাড়ী তখন প্লাটফরম্ ছাড়াইয়া গিয়াছে।

তখন হেমকান্তির ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠাধরযুগলের মধ্য হইতে কবি ও দার্শনিকের অনুকারী পরিমিত গোলাপী হাস্যের পরিবর্ত্তে উজ্জ্বল দশনরাজি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়া উঠিল।

ভক্তি না ধর্ম্ম ?

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্যামাচরণ বেদান্তবাগীশ প্রাত্যহিক দেবপূজা সমাপ্ত করিয়া বহির্বাটীতে আসিলেন। ভৃত্য প্রভুর জন্য তামাক সাজিয়া আনিল। স্নান ও পূজা আহ্নিক সমাপ্ত না করিয়া বেদান্ত-বাগীশ কখনও তাম্রকূটধূম পর্য্যন্ত সেবন করিতেন না।

তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। অদূরে গ্রামের হরকরার মূর্ত্তি দেখা দিল। সে নিকটে আসিলে বেদান্তবাগীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পরাণ, আমাদের চিঠিপত্র কিছু আছে না কি ?"

দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে গ্রামের সকলেই প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। পরাণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে এক খানি পত্র অর্পণ করিল।

পুত্র জ্ঞানচন্দ্র দুই বৎসর প্রবাসবাসী। সপ্তাহ অন্তর এক এক খানি পত্র পাইলেও স্নেহশীল পিতার হৃদয় পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইত। বাইশ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার পর জ্ঞানচন্দ্র লাহোর কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করে। অবকাশের অভাব ও তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের

আর একটা নূতন পরীক্ষার জন্য বাস্ত থাকায়, দুই বৎসরের মধ্যে সে জনক জননীর চরণদর্শন করিতে পারে নাই। গর্ব্ব ও আশার সমুজ্জ্বল নক্ষত্র, বংশের কুলপ্রদীপ পুত্রকে বিদেশে পাঠাইয়া পিতা অধিকাংশ রজনী অনিদ্রায় অতিবাহন করিতেন ; কিন্তু সে কথা তাঁহার গৃহিণী পর্য্যন্ত জানিতেন না।

গ্রামের কেহ কোনও বিষয়ে কখনও বেদান্তবাগীশকে বিচলিত হইতে দেখে নাই।

ব্রাহ্মণ পত্রখানি খুলিলেন। লেখা দেখিয়া বুঝিলেন, বনগ্রাম হইতে শ্যালক রামতারণ স্মৃতিভূষণ লিখিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মথুরা ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তথা হইতে, স্নেহের ভাগিনেয়কে দেখিবার জন্য লাহোর পর্য্যন্ত ছুটিয়াছিলেন। তারপর,—

ব্রাহ্মণ দক্ষিণ হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া রৌদ্রের কাছে পত্র খানি ধরিয়া আবার পাঠ করিলেন। না না! তাঁহার দৃষ্টির বিন্দুমাত্র ভ্রম নহে। পরিস্ফুট ভাবে প্রাণান্তকর ভীষণ সংবাদ পত্রে লিখিত রহিয়াছে।

বেদান্তবাগীশের সমদেহ টলিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। দেওয়াল ধরিয়া ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে প্রথম তীব্র আঘাতের বেগ সংবরণ করিলেন। তার পর ধীরে ধীরে চৌকীর উপর বসিয়া পড়িলেন।

পতন! সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপ্রাণ, আদর্শচরিত্র পুত্র, যাহাকে তিনি হিমালয়ের ন্যায় অটল, ভাগীরথীর ন্যায়

পুণ্যশীল, সূর্য্যের ন্যায় শুভ্র, তীব্র দীপ্তিশালী ভাবিয়া এত দিন অপূর্ব্ব আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছিলেন, আজ সেই পুত্রের এমন শোচনীয় অধঃপতন ! বাইশ বৎসরের ধর্ম্ম-শিক্ষা ধূলি-তলে মিশাইয়া গেল ! জ্ঞানের সুদৃঢ় বন্ধন একটা হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না ? দুই বৎসরের অদর্শনে এত কালের দীক্ষা ব্যর্থ হইয়া গেল ? বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় একাগ্র ধ্যানে তিনি ধীরে ধীরে যে ছবিটিকে শুভ্র যশের উজ্জ্বল প্রভায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আজ তাহা পথের ধূলার অপেক্ষাও কলঙ্ক-মলিন !

শ্যালক লিখিয়াছিলেন, হতভাগ্যের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে এখন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। দেশে আর সে কখনও যে ফিরিয়া যাইবে, সে সম্ভাবনা নাই। নবধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্য হইতে পাত্রী মনোনীত করিয়া বিবাহাদি করিবে। এই ব্যাপার লইয়া লাহোর-প্রবাসী বাঙ্গালী মহলে বেশ আন্দোলন চলিতেছে। কোন পরিচিত বাঙ্গালীর নিকট এই সংবাদ পাইয়া স্মৃতিভূষণ ভাগিনেয়ের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই দারুণ মর্ম্মপীড়া লইয়া সেই রজনীতেই লাহোর ত্যাগ করেন।

অগ্নিগর্ভ গিরির ন্যায় ব্রাহ্মণ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। জীবনে তিনি এমন প্রতারিত কখনও হয়েন নাই—এরূপ কঠোর আঘাত এই প্রথম।

প্রবাস-গমনের পূর্ব্বে যে দিবস পুত্র অশৈশবের অভ্যাস

অনুসারে চন্দন-চর্চ্চিত পুষ্পমাল্যে জনক-জননীর চরণ বন্দনা করিয়াছিল, সেই সুপবিত্র দিনের স্মৃতি আজ বেদান্তবাগীশের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। জ্ঞানচন্দ্র যে এক দিনও পিতা মাতার পাদ্য-অর্ঘ্য পান না করিয়া আহার্য্য স্পর্শ করিত না! প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া গায়ত্রীজপ ও বেদপাঠ না করিয়া কোনও কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিত না। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাহার হৃদয়কে স্বধর্ম্মে আরও অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রাহ্মণ আশৈশব স্বয়ং পুত্রকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক দিবসের কার্য্যকলাপ তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কই তাহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতার চিহ্ন কোনও দিন ত তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই! তবে আজ অকস্মাৎ হিমালয়ের উন্নত চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল কেন?

ভৃত্য আসিয়া দুইবার সংবাদ দিল, আহার্য্য প্রস্তুত, মা ঠাকুরাণী তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ তখনও নিশ্চল প্রতিমার মত বসিয়া রহিলেন। অকারণ বিলম্বে বাড়ীর লোক চঞ্চল হইয়া উঠিল। গৃহিণী প্রমাদ গণিয়া স্বয়ং বহির্ব্বাটীতে আসিলেন।

বেদান্তবাগীশ তখন একখানি পত্র লেখা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

স্বামীর আরক্ত নয়ন, মেঘাচ্ছন্ন গগনের ন্যায় গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া অনিশ্চিত আশঙ্কায় পত্নীর হৃদয় কাঁপিয়া

উঠিল। ভীতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ভাত খাবে না? আজ তোমার হয়েছে কি?"

ব্রাহ্মণ সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না।

গৃহতলে স্মৃতিভূষণের পত্রখানি পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণী সেখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "কে লিখিয়াছে?"

"পড়িয়া দেখ।"

পত্রপাঠান্তে বেদনা-বিদীর্ণ-হৃদয়ে শ্যামাচরণের পত্নী ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। বর্ষাপ্লাবিতা নদীর স্রোতের ন্যায় তাঁহার দুইগণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

"তখন তোমায় বলিয়াছিলাম, বিদেশে আমার জ্ঞানকে—"

তর্জ্জনী তুলিয়া তীব্রস্বরে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "চুপ্, আর না। আজ হইতে ও নাম আমার বাড়ীতে কেহ উচ্চারণ করিতে পারিবে না।"

স্বামীর কঠোর বচনে পত্নীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বেদান্তবাগীশের প্রকৃতি তিনি বিলক্ষণ চিনিতেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে, সকাতরে তিনি স্বামীর পানে চাহিলেন।

মুহূর্ত্তের জন্য ব্রাহ্মণের ওষ্ঠপ্রান্তে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। হস্তস্থিত পত্রখানি তুলিয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন, "কি লিখিয়াছি শুনিয়া রাখ।"

পত্রে লেখা ছিল, "শুনিলাম, তুমি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছ। উত্তম। যদি তুমি মূর্খ, অশিক্ষিত হইতে, আমি সস্নেহে তোমাকে তিরস্কার করিতাম, অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া

তোমাকে বক্ষে তুলিয়া লইতাম। কিন্তু তুমি মূর্খ নহ। আমার উপার্জ্জিত সমস্ত বিদ্যা তোমাকে দান করিয়াছি, সহস্র যুগের সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে বহুল রত্ন তুমি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়াছ, বিশ্ববিদ্যালয়ও তোমাকে জ্ঞানদান করিতে কৃপণতা করে নাই। সুতরাং তুমি তিরস্কারের অযোগ্য, একবিন্দু ক্ষমাও তোমার প্রাপ্য নহে। জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে যাহার হৃদয় প্রদীপ্ত, সত্যানুসন্ধানের জন্য তাহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ, আমার মতে গুরুতর পাপ! সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কোনও ক্রমে সে ক্ষমা পাইবার অধিকারী নহে। পুত্র হইলেও সে ত্যাজ্য। এতদিন যাহাদের সহিত তোমার রক্তমাংসের সম্বন্ধ ছিল, আজ হইতে তাহাদের সহিত তোমার কোনও সংস্রব রহিল না। শিক্ষা ও জ্ঞানের এক কণিকাও যদি এখনও তোমাতে অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আত্মীয় সমাজে তোমার কলঙ্কিত মুখ দেখাইবার চেষ্টা করিও না। আজ হইতে আমাদের কাছে তুমি মৃত। তোমার সহিত আমাদের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। মর্ম্মাহত পিতার অভিশাপে যদি এতটুকু ভয় থাকে, তবে ভবিষ্যতে আত্মীয়বর্গের সহিত বাক্যে বা ব্যবহারে সম্বন্ধ-জ্ঞাপনের প্রয়াস পাইও না।”

স্বামীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া পত্নী উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন, “ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, এত নির্দ্দয় হইও না।”

বাহুপাশ হইতে চরণ মুক্ত করিয়া অকম্পিত পদে ব্রাহ্মণ আহারার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুই সপ্তাহ স্বামীর কোনও সংবাদ না পাইয়া বসন্তকুমারী পত্র লিখিতে বসিয়াছিল। পার্শ্বে চারিবৎসরের পুত্র ফেলু বসিয়া বসিয়া তাসের ঘর নির্ম্মাণ করিতেছিল।

মাতার বাক্সটি খোলা দেখিয়া শিশু তাসের ঘর রাখিয়া দিল। নূতন কিছু খেলার জিনিস পাইবার আশায়, সে বাক্সের অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া, উলটিয়া পালটিয়া দেখিতে লাগিল। সহসা একখানি বাঁধান ফটো কাগজের অন্তরাল হইতে আত্মপ্রকাশ করিল। ফেলু ছবিখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "মা, মা, দেখ কেমন ছবি!"

বসন্তকুমারীর চিঠিলেখা শেষ হইয়াছিল। সে ফিরিয়া চাহিয়া পুত্রের কীর্ত্তি দেখিল। তখন তাড়াতাড়ি সে ফটোখানি কাড়িয়া লইতে গেল।

শিশু প্রাণপণ যত্নে ছায়াচিত্র খানি বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া হাসির লহর তুলিয়া বলিল, "না, আমি দেব না।"

মাতা বলিল, "ছিঃ বাবা, ছিঁড়ে যাবে। তোমার মামাবাবুর ছবি। লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, দাও আমি রেখে দি, তুমি বড় হইলে নিও।"

"মামাবাবু? সে কে মা? কই আমি ত তাকে দেখি নি, সে কোথায়?"

বসন্তকুমারীর নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। আজ দীর্ঘ দ্বাদশ-বৎসর দাদার স্নেহময় মূর্ত্তি সে দেখে নাই। তিনি কোথায় কি অবস্থায় আছেন, তাহা সে জানে না। জানিবার অধিকার হইতেও সে বঞ্চিত। জাতিচ্যুত ভ্রাতার অনুসন্ধান কে করিবে? সমস্ত সংসার যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে! প্রবাস-গমনের পূর্ব্বে দাদা সকলের ছবি তুলাইয়াছিলেন, সেই সঙ্গে তাঁহারও ছবি তোলা হইয়াছিল। সেই দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বের ফটোখানি দাদার একমাত্র স্মৃতি। বসন্ত সেখানি অতি গোপনে রক্ষা করিয়াছিল। পিত্রালয়ে বা স্বামিগৃহে সে ছবি প্রকাশ্যভাবে বাহির করিতে তাহার সাহস হইত না। যখন দাদার কথা মনে পড়িত—হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইত, সেই সময়ে সে গোপনে ছায়াচিত্র খানি বাহির করিয়া দেখিয়া লইত।

মাতাকে নীরব দেখিয়া শিশু আবার বলিল, "বল্ না মা, মামাবাবু কোথায়? সে কখনও এখানে আসে না কেন? দেখা পেলে আমি তাকে মারবো।"

ফেলু অভিমানভরে তাহার ক্ষুদ্র মুষ্টি শূন্য পানে উদ্যত করিল।

বসন্ত নয়নে অঞ্চল চাপিয়া অশ্রুবেগ রুদ্ধ করিতে চাহিল।

এমন সময় কক্ষের বাহিরে খড়মের শব্দ হইল। বেদান্ত-বাগীশ কন্যার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার মুখ গম্ভীর। সেই গম্ভীর আননে বেদনার অস্ফুট রেখা তখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

শিশু দাদা মহাশয়ের কাছে ছুটিয়া গেল। ফটোখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দাদা ম'শায়, মা আমাকে মামাবাবুর ছবি দিয়েছে। দাদা, মামাবাবু কোথায় ? আমি তার কাছে যাব।"

কিন্তু অন্য দিনের মত দাদামহাশয়ের মুখে প্রসন্ন হাসিটি না দেখিয়া শিশু বিস্মিতভাবে চমকিয়া দাঁড়াইল। দাদা মহাশয় আজ তাহাকে কোলে লইল না কেন ? অভিমানে ফেলুর হৃদয় পূর্ণ হইল। ম্লানমুখে, ছল-ছল-নেত্রে সে জননীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

পিতা ডাকিলেন, "বসন্ত !"

সে আহ্বানে সহস্র তিরস্কারের তীব্রগর্জ্জন যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অপরাধিনীর ন্যায় নতমুখে বসন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল।

ফেলু, বিস্ময়দীপ্ত নয়নযুগল তুলিয়া একবার জননীর, আরবার মাতামহের পানে চাহিতে লাগিল। তাহার কুন্দ-শুভ্র অকলুষ হৃদয়ে কুটীল সংসারের তীব্র তাপ ত স্পর্শ করে নাই !

গম্ভীরকণ্ঠে বেদান্তবাগীশ বলিলেন, "পিতা হইয়াও যে পুত্রের আদর্শ চরিত্রকে একদিন মনে শ্রদ্ধা করিতাম, এখন তাহার অপবিত্র স্মৃতি হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছি। এই সরল সুন্দর শিশুর পবিত্র হৃদয়ে তাহার

কলঙ্কিত স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া তুমি মহাপাতক করিয়াছ। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহার কলুষিত ছবিখানি এই মুহূর্ত্তে অগ্নিতে সমর্পণ কর।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বসন্ত বলিল, "বাবা, বাবা, অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

ব্রাহ্মণ তখন কক্ষ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

সেই রজনীতে ব্রাহ্মণ গৃহিণীকে বলিলেন, "অনেকদিন হইতে তুমি তীর্থ-ভ্রমণের কথা বলিয়া আসিতেছ। আমি সমস্ত ঠিক করিয়াছি। আগামী বুধবার পঞ্চমী তিথিতে যাত্রা করিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেদান্তবাগীশ বারাণসীধামে আসিয়া যেখানে বাসা করিলেন, তাহার সংলগ্ন একটি প্রশস্ত ও প্রকাণ্ড অট্টালিকায় একটি দানসত্র। তথায় প্রত্যহ বহুশত ক্ষুধিত নরনারী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পাইত।

তীর্থে আসিয়া গঙ্গাস্নান ও দেবদর্শনব্যতীত ব্রাহ্মণের অন্য বিশেষ কোন কার্য্য ছিল না। তিনি অবশিষ্ট সময় দানসত্রে প্রবেশপূর্ব্বক দরিদ্রদিগের ভোজনকার্য্য পরিতৃপ্তনয়নে দর্শন করিতেন। ব্রাহ্মণ নিজগ্রামে প্রতি বৎসর পূজার

সময় স্বয়ং শত শত দরিদ্রকে অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করিয়া থাকেন। বার্ষিক পঞ্চ সহস্র মুদ্রা আয়ের ব্রহ্মোত্তর জমীর অধিকাংশই তিনি দীন দরিদ্রের সেবায় ব্যয় করিতেন। সুতরাং পবিত্র তীর্থস্থানে এরূপ সুন্দর কল্যাণকর অনুষ্ঠান দর্শনে বেদান্তবাগীশ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

সত্রের তত্ত্বাবধানের ভার জনৈক পরিণতবয়স্ক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। কর্ম্মচারী এই তেজঃ-পুঞ্জকলেবর পরম পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সহিত আলাপে মুগ্ধ হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে উভয়ের সৌহৃদ্য জন্মিল।

বেদান্তবাগীশ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এই অন্নসত্রের প্রতিষ্ঠাত্রী ব্রাহ্মণকন্যা চিরকুমারী। স্বর্গীয় পিতার দুইলক্ষ টাকা আয়ের জমীদারীর সমস্ত অর্থই তিনি দীন দরিদ্রের দুর্দ্দশামোচন ও অন্নসত্রের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন।

সেদিন আকাশে ঘোরঘটায় মেঘ করিয়াছিল। পূর্ব্ব-রজনীতে প্রবল বারিপাত হইয়া গিয়াছে। বেলা নয়টা বাজিয়া গেল। অন্নসত্রের পাচকেরা তখনও রন্ধনশালায় দেখা দিল না দেখিয়া কর্ম্মচারী প্রমাদ গণিলেন। বাতাস ক্রমে প্রবলতর হইল। বর্ষণ তখনও থামিল না।

বেদান্তবাগীশ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান ও পূজা আহ্নিক সারিয়া অন্নসত্রে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আজিকার মেঘমেদুর আকাশ দেখিয়া তিনি আর বিশ্বেশ্বর-দর্শনে গমন করেন নাই।

উদরের জ্বালা যাহাদের প্রবল, ঝড় বৃষ্টির বাধা তাহাদের নিকট তুচ্ছ। একে একে ভিক্ষুকগণ প্রাঙ্গণতলে সমবেত হইতে আরম্ভ করিল। কর্ম্মচারী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন

এমন সময় আর্দ্রদেহ, সিক্তবসন ভিক্ষুকমণ্ডলী হইতে একটি আনন্দ কোলাহল উঠিল, "মায়ীজী কি জয়।"

বেদান্তবাগীশ সবিস্ময়ে দেখিলেন, অন্নপূর্ণার ন্যায় মহিমশ্রী-মণ্ডিতা গৈরিক-বসন-ধারিণী এক নারীমূর্ত্তি প্রাঙ্গণসীমা অতিক্রম পূর্ব্বক তাঁহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ব্রহ্ম-চর্য্যের কঠোর সংযমে রমণীর যৌবনশ্রী এক বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও মহিমায় উদ্দীপ্ত, কিন্তু তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল, দীপ্তিময় নয়ন-যুগলে, শান্ত, সুন্দর, করুণ মুখমণ্ডলে বিষাদরেখা অঙ্কিত। উজ্জ্বলপ্রভাপ্রদীপ্ত রত্নের অঙ্গে কেহ যেন একটি কাল রেখা টানিয়া দিয়াছে।

ব্রাহ্মণ এই নবীনা সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, ইনিই অন্নসত্রেব প্রতিষ্ঠাত্রী, জমীদারনন্দিনী। সন্ন্যাসিনী মন্থরগতিতে কর্ম্মচারীর সম্মুখীন হইয়া স্নিগ্ধ করুণকণ্ঠে বলিলেন, "আজ আমার অতিথিসেবা কি ব্যর্থ হইবে ? এতদিনের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কি আজ এমনই ভাবে অসম্পূর্ণ থাকিবে ? দেখিতেছেন না, এত বেলা হইল এতগুলি ক্ষুধিত প্রাণী ব্যাকুলভাবে অন্নের প্রতীক্ষা করিতেছে ?"

কর্ম্মচারী চঞ্চল হইলেন। নৈরাশ্যপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "কি করিব মা লক্ষ্মী, যে দুর্য্যোগ, একটি পাচকও আসিল না।"

"তবে কি আজ এতগুলি প্রাণী উপবাসী থাকিবে ?"

বেদান্তবাগীশ বলিলেন, "মা, যদি তোমার কোনও আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আজিকার রন্ধনশালার ভার আমার উপর দাও। বৃদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু এখনও পাঁচশত লোকের অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে বোধ হয় কাতর হইব না। এ শুভ কার্য্য হইতে আমায় বঞ্চিত করিও না মা।"

সন্ন্যাসিনীর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সজল-নেত্রে উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আপনি কে জানি না, কিন্তু সত্যই আজ আপনি আমার পিতার কাজ করিলেন। আজ মহাপাতক হইতে আপনিই আমায় উদ্ধার করিলেন।"

বেদান্তবাগীশ নামাবলী কটিদেশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রন্ধনশালার অভিমুখে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাক্যে বা ব্যবহারে বেদান্তবাগীশের নিদারুণ মর্ম্মপীড়ার কথা কখনও ব্যক্ত হইত না। কিন্তু যাহারা নীরবে সহ্য করে, তাহারা গভীরতররূপে আহত হয়। পুত্রের প্রতারণায় ও নির্দ্দয় ব্যবহারে বেদান্তবাগীশের অন্তরতম প্রদেশে যে শেলাঘাত হইয়াছিল, এই দীর্ঘ কালে তাহার ক্ষত বিলুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, আরও পরিপুষ্ট ও বিস্তৃত হইয়াছিল। যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবার

আশায় তিনি তীর্থবাসী হইয়াছিলেন। অন্নসত্রের কর্ম্মকোলাহলে ও দেবতা-অর্চ্চনায় দিবাভাগে তিনি আপনাকে নিমগ্ন রাখিয়া, স্মৃতির অঙ্কুশতাড়না হইতে বিমুক্ত হইতেন বটে, কিন্তু রজনীর নিস্তব্ধতায় অধিকাংশ ভাগ অনিদ্রায় কাটিত। তথাপি তিনি পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে আসিয়া হৃদয়ে কতকটা তৃপ্তি পাইয়াছিলেন।

একমাস পরে একদিন সন্ধ্যার পর শ্যামাচরণ বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিয়া বাসায় ফিরিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়াছিল। নির্জ্জনে একটু কাঁদিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

জনতা, কোলাহল আজ তাঁহার কাছে তিক্ত বোধ হইল। হৃদয়ের এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বেদান্তবাগীশ বিস্মিত হইলেন। এত কোমলতা, এত দুর্ব্বলতা হৃদয়ে কোথা হইতে আসিল!

কোনও প্রবাসী বাঙ্গালী পথিক ঝিঁঝিট সুরে গাহিয়া উঠিল,—

"বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও,
ফিরাও না জননী!"

ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে চলিলেন। পথিকের সকরুণ সঙ্গীত ধ্বনি তাঁহার বিচলিত হৃদয় স্পর্শ করিল।

একেবারে বাড়ীর দ্বারে আসিয়া বেদান্তবাগীশ নিশ্বাস ছাড়িলেন। অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠ হইতে দৌহিত্র ফেলুর কণ্ঠ-স্বর শোনা গেল। ব্রাহ্মণ গঙ্গার তীরাভিমুখে চলিলেন।

কিছুক্ষণ নির্জ্জনে না বসিলে তাহার চঞ্চল হৃদয় প্রকৃতিস্থ হইবে না।

অন্নসত্রের সংলগ্ন ঘাটটি রাত্রিকালে জনশূন্য থাকে, বেদান্ত-বাগীশ ধীরে ধীরে সেইদিকে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ণ শশাঙ্কের আলোক-প্লাবনে নীল অম্বরতল উদ্ভাসিত। ব্রাহ্মণ সোপান শ্রেণী অবতরণ করিতে লাগিলেন। জনশূন্য ঘাটে, সোপানগাত্রে তরঙ্গ প্রহত হইতেছিল।

বামপার্শ্বে একটি শিবমন্দির। মন্দিরের সম্মুখে একটি মর্ম্মর স্তম্ভ। সেখানে বসিলে সহসা কেহ দেখিতে পায় না। বেদান্তবাগীশ সেইদিকে চলিলেন। স্তম্ভের সমীপবর্ত্তী হইবা-মাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি নারীমূর্ত্তি তাহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রমণীর সম্মুখে স্তূপীকৃত গন্ধপুষ্প।

ব্রাহ্মণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, রমণী দানছত্রের প্রতিষ্ঠাত্রী। মৃদুপবনে তাহার গৈরিক বসন, রুক্ষ কেশভার অনাবৃত করিয়া ভূমিতলে লুটাইতেছিল।

রমণী যুক্তকরে উন্নত আনন আলোকপ্লাবিত গগনের পানে স্থাপিত করিলেন। বায়ুস্তর ও চন্দ্রকিরণদীপ্ত অম্বরতল বিদীর্ণ করিয়া সন্ন্যাসিনীর ব্যাকুল হৃদয়ের নীরব প্রার্থনা যেন অলক্ষ্য দেবতার চরণতলে ছুটিয়া চলিল।

বেদান্তবাগীশ বিস্মিত, মুগ্ধ ও পুলকিত হইলেন। এমন সুন্দর, পবিত্র, মোহন দৃশ্য ব্রাহ্মণ বহুদিন দেখেন নাই।

সাধিকার নীরব অর্চ্চনা, একাগ্র আরাধনা তাঁহার অন্তরতম প্রদেশ আলোড়িত করিল। বহু—বহু পূর্ব্বে কেবল একজন এমনই ভাবে নির্জ্জন প্রান্তরে, জনশূন্য জলাশয় তটে দাঁড়াইয়া এমনই ভক্তিভরে বিশ্ব-সুন্দরের আরাধনা করিত। শতশতবার তিনি গোপনে সে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সে ত অতীত যুগের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস! মিথ্যার কলঙ্ক-কালিমা সে অতীত কাহিনীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

শূন্য সাজি হস্তে তুলিয়া লইয়া রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা সোপানোপরি শুভ্রবসন পুরুষ-মূর্ত্তি দেখিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"কে ওখানে ?"

"মা, ভয় নাই আমি।"

সন্ন্যাসিনী সে সস্নেহ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্তা হইয়া নিকটে সরিয়া আসিলেন। বেদান্তবাগীশকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "এমন সময়ে আপনি এখানে কেন ?"

"ক্ষমা কর মা, তোমার নির্জ্জন আরাধনায় বাধা দিয়া আমি অপরাধ করিয়াছি।"

"সে কি, আপনি পিতৃতুল্য, ওরূপ কথা বলিবেন না।"

বেদান্তবাগীশ উচ্ছ্বাসভরে বলিলেন, "মা, তোমার আরাধনা দেখিয়া আজ একজনের কথা মনে পড়িয়াছিল। সে তোমারই মত এমনই ভক্তিভরে ভগবানের আরাধনা করিত ; কিন্তু—" বেদান্তবাগীশের কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হইল। বহু প্রয়াসেও তিনি অশ্রুস্রোত রুদ্ধ করিতে পারিলেন না।

বেদনা-ব্যথিত স্বরে সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "তিনি কি বাঁচিয়া নাই ?"

"জানিনা মা, জানিতে ইচ্ছাও নাই। মৃত্যুই তাহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। সে আমায় বড় দাগা দিয়াছে। হায়! জ্ঞানের সুদৃঢ় রজ্জুও তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। সে এখন ভণ্ড, প্রতারক, বিধর্ম্মী।"

সন্ন্যাসিনী ভাগীরথীর পর পারস্থ সুদূর-বিস্তৃত শূন্য প্রান্তর পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকে যাহার হৃদয় সমুজ্জ্বল, তুচ্ছ অনুষ্ঠানের আকাঙ্ক্ষা তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে কি? প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু ইহাতে আমার বিশ্বাস স্থাপন করিতে আস্থা হয় না।"

সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। বাতাস পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া আবার ছুটিয়া আসিল। ব্রাহ্মণ স্তম্ভের পাদমূলে, নিবেদিত পুষ্পস্তূপের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বসন্ত বলিল, "বাবা, ফেলুর আজ তিন চারি দিন হইতে অল্প অল্প জ্বর হইতেছে। ছেলেটা কিছু খাইতে চায় না।"

বেদান্তবাগীশ কয় দিবস সংসারের কোনও তত্ত্ব লয়েন নাই। তাঁহার হৃদয়ে একটা বিপ্লব বাধিয়াছিল। কিন্তু দৌহিত্রের পীড়ার সংবাদে ব্রাহ্মণের বিক্ষিপ্ত মনটা সংসারের দিকে আবার ফিরিয়া আসিল। তিনি ভাবিলেন, পরের ছেলেকে সঙ্গে আনিয়াছেন, সুতরাং তাহার শুভাশুভের জন্য তিনিই দায়ী। এতদিন তাচ্ছীল্য করিয়া কাজটা ভাল করেন নাই।

বাড়ীওয়ালার নিকট তিনি সংবাদ পাইলেন, শিকরোলে এক জন ভাল বাঙ্গালী ডাক্তার আছেন। একপ বিজ্ঞ চিকিৎসক বারানসীধামের মধ্যে আর নাই। গরীব দুঃখীকে তিনি বিনা অর্থে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। শ্যামাচরণ তাঁহাকেই ডাকা স্থির করিলেন। প্রথম হইতেই ভাল চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করানই সঙ্গত। উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং বহির্গত হইলেন।

তখন সন্ধ্যার শান্তিচ্ছায়া চারিদিকে ঘনাইয়া আসিয়াছিল, দেবালয় সমূহে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছিল।

স্বল্পায়াসেই ডাক্তার মুখার্জ্জির নাতিবৃহৎ আলোকিত একতল অট্টালিকা বেদান্তবাগীশের চক্ষে পতিত হইল। বেলা, জবা, গোলাপ ও যূথিকা-কুঞ্জবহুল পুষ্পোদ্যানের মধ্যবিসর্পিত

কঙ্করাকীর্ণ সুদৃশ্য পথ অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ ডাক্তার বাবুর বসিবার কক্ষে পৌঁছিলেন। কক্ষে কক্ষে আলোক জ্বলিতেছিল, একজন ভৃত্য সম্মুখে বসিয়াছিল। ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় শুনিয়া সে তাঁহাকে কক্ষমধ্যে বসিতে অনুরোধ করিল। ডাক্তার বাবু তখনও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, শীঘ্রই আসিবার সম্ভাবনা। ভৃত্য তামাক সাজিতে গেল। শ্যামাচরণ ডাক্তারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ধূমপান করিতে করিতে বেদান্তবাগীশ কক্ষটির চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, দেওয়ালে নানাবিধ হিন্দু দেব দেবীর সুদৃশ্য চিত্র। গৃহের সর্ব্বত্রই গৃহস্বামীর সুরুচি ও সৌন্দর্য্যানু-রাগের যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ ডাক্তারের সুরুচির নিদর্শন দেখিয়া অন্তরে তৃপ্তিলাভ করিলেন।

বাড়ীতে একজন পাচক ও একটি ভৃত্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না। ডাক্তার বাবু তথায় একাকীই থাকিতেন।

পার্শ্বস্থ একটি কক্ষ হইতে ঘন সুগন্ধ বহির্গত হইতেছিল। সে সুগন্ধে ব্রাহ্মণের হৃদয় যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ঘরের দরজাটা খোলা ছিল। বেদান্তবাগীশ উঠিয়া দাঁড়া-ইলেন। দরজার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কক্ষটি জনশূন্য। দেওয়ালে একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে। গৃহের মধ্যস্থলে একটি মর্ম্মর বেদী। বেদীর সম্মুখে একটি প্রশস্ত অনুন্নত স্তম্ভ। স্তম্ভের পাদদেশে প্রত্যগ্র পুষ্পভার।

যেন কোনও ভক্ত বাঞ্ছিত দেবতার চরণতলে এইমাত্র পুষ্প অর্ঘ্য প্রদান করিয়া গিয়াছে। বেদান্তবাগীশ চমৎকৃত হইয়া, দেখিলেন, স্তম্ভগাত্রে দুই খানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র ; নিম্নে বেদীর পার্শ্বে অনুরূপ আর এক খানি চিত্রপট।

সহসা কৌতূহলের আতিশয্যে ব্রাহ্মণের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আলেখ্যগুলি যেন নীরবে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। অলক্ষ্য আকর্ষণে অভিভূত হইয়া ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, নবযৌবনশ্রীমণ্ডিতা বিচিত্রবেশধারিণী এ কিশোরী মূর্ত্তি কাহার ? নয়নে কি অপূর্ব্ব দীপ্তি, অধরে কি মধুর হাস্য ! এ স্নিগ্ধ হাস্যরেখা তিনি কাহার আননে উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছেন ? সন্ন্যাসিনীর সহিত এই আনন্দলতিকার সাদৃশ্য কি বিস্ময়কর নহে ?

বিস্মিত ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধে চাহিলেন। তৈলচিত্রদ্বয়ের একটি নারী, অপরটি পুরুষমূর্ত্তি। এ সকল ছবি এখানে কে আনিল ?

সহসা বাহিরে মনুষ্যকণ্ঠস্বর শোনা গেল। বেদান্তবাগীশ দ্রুতবেগে বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

একব্যক্তি সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি ডাক্তার বাবু ?"

"আজ্ঞা না, তিনি বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন। আমি কম্পাউণ্ডার। মহাশয়ের কোথায় থাকা হয় ?"

ভক্তি না ধর্ম্ম?

লোকটি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী, কিন্তু তাহার বেশের সহিত বাক্যের যথেষ্ট প্রভেদ দেখিয়া শ্যামাচরণ কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন! কম্পাউণ্ডার বিশুদ্ধভাষায় বেদান্ত-বাগীশের সহিত আলাপ করিতেছিল।

কম্পাউণ্ডার বলিল, "আপনি বিদেশী, তাই অসময়ে আসিয়াছেন। এখানকার সকলেই জানেন, সন্ধ্যার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে না আসিলে ডাক্তার বাবুর দেখা পাওয়া যায় না। বিশ্বেশ্বরের চরণামৃতপান ও আরতি দর্শন না করিয়া ডাক্তার বাবু কোনও কার্য্যে হস্তার্পণ করেন না।"

বেদান্তবাগীশ বলিলেন, "আপনি ইঁহার কাছে কত দিন আছেন?"

কম্পাউণ্ডার হাসিয়া বলিল, "ডাক্তারী পাশ করিবার অনেক পূর্ব্বে ডাক্তার বাবুর সহিত আমার পরিচয়। তিনি দুর্ভিক্ষের সময় আমার পরিবারবর্গকে অন্নদানে বাঁচাইয়া ছিলেন। সেই অবধি আমি তাঁহার গোলাম।"

ভৃত্য পুনরায় তামাক সাজিয়া আনিল। বেদান্তবাগীশ ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, "ডাক্তার বাবুর সন্তানাদি কি?"

"সন্তান? এখনও তাঁহার বিবাহই হয় নাই।"

"বলেন কি মহাশয়, এত বয়সেও তিনি অবিবাহিত রহিয়াছেন?"

অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে কম্পাউণ্ডার বলিল, "একবার তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল; সে অনেকদিনের কথা, তখন

তিনি ডাক্তারী পড়েন। ডাক্তার বাবুর বাড়ীর পার্শ্বে লাহো-রের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতেন। তিনি বিলাত-ফেরত বাঙ্গালী। উভয়ে বহুকাল একই বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন, এজন্য বাল্যাবধি পরস্পরের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল।

বেদান্তবাগীশ চমকিয়া উঠিলেন।

কম্পাউণ্ডার বলিল, "কি হইল ?"

"কিছু না, বলিয়া যান।" বেদান্তবাগীশ গাঢ় অভিনিবেশ সহকারে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

কম্পাউণ্ডার বলিল, "একদিন শোনা গেল যে, ম্যাজি-ষ্ট্রেট সাহেবের ভগিনীর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বলিয়া পিতা মাতা, কন্যাসহ লাহোরে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে আসিতেছেন। তাঁরা নাকি খুব বড় জমীদার। আমি তখন সর্ব্বদা ডাক্তার বাবুর বাড়ী থাকিতাম।

"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভগিনীর পনের বৎসর বয়স হইলেও, তখনও বিবাহ হয় নাই। ডাক্তার বাবু সর্ব্বদাই বন্ধুর বাড়ী যাইতেন। বিদ্যায়, রূপে গুণে ও কুলে শীলে সর্ব্বাংশে উপ-যুক্ত দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পিতামাতা ডাক্তার বাবুর সহিত কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে বিষয়ে ডাক্তার বাবুরও অমত ছিল না। কন্যা আরোগ্য লাভ করিলে পিতামাতার অনুমতি লইয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে, আমরা সকলেই এইরূপ কথা শুনিয়াছিলাম।

"এক বৎসর পরে কন্যার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। এমন সময় একদিন শুনিতে পাইলাম, ডাক্তার বাবু বন্ধুকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি আজীবন অবিবাহিত থাকিবেন। এরূপ আকস্মিক মত পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। আকার ইঙ্গিত দেখিয়া আমরা বুঝিয়াছিলাম, ডাক্তার বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভগিনীকে অত্যন্ত ভালবাসেন; শুনিয়াছিলাম কন্যাও ডাক্তার বাবুর বিশেষ অনুরাগিণী। অথচ অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কেন হইল বুঝিতে পারিলাম না।"

বেদান্তবাগীশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "পাশের ঘরে কয়েক খানি ছবি দেখিলাম। ছবিগুলি ডাক্তার বাবু কোথায় পাইলেন?"

"দু'খানি ছবি ডাক্তার বাবুর পিতামাতার। প্রত্যহ দুইবেলা তৈলচিত্রের সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া ডাক্তার বাবু বিশ্বেশ্বরের চরণামৃতও পান করেন না। তৃতীয় চিত্রপট—"

ব্রাহ্মণের কম্পিত হস্ত হইতে হুঁকা সশব্দে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। বেদান্তবাগীশ আর দাঁড়াইলেন না।

সমাপ্ত।